KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১১৫নং বেনিয়াপুকুর রোড, কল-১৪
Collection : KLMLGK	Publisher : তরুণ চন্দ্র মিত্র
Title : চিত্র	Size : 7.25" x 9.5" 18.41 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/2 2/3 3/1 3/2 3/3	Year of Publication : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৫ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫৮ শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ, ১৩৫৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সুহৃৎচন্দ্র মিত্র	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

চিত্ত

মনোবিদ্যাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

তৃতীয় বর্ষ | কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬৮ | তৃতীয় সংখ্যা

সূচীপত্র

মানসিক-স্বাস্থ্যের গোড়ার কথা	—অসিতশংকর ভাদুড়ী	...	৯৯
শিশুর যৌন কৌতূহল ও তার গুরুত্ব	—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০৪
শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য	—সন্ধ্যা ভট্টাচার্য্য	...	১১৩
সমাজ-মন	—গোপীবল্লভ সাহা	...	১১৬
সুখ-দুঃখ ও বাস্তব	—তরুণচন্দ্র সিংহ	...	১১৯
রাসেলীয় বিশ্লেষণ	—অলক মজুমদার	...	১২৪
চরিত্র বিচিত্রা	—উদয়চাঁদ পাঠক	...	১২৭
লুম্বিনির রচনা ও কলা :			
"চিত্তভ্রংশী-ভ্রমবাতুলতা"	—কনক মজুমদার	...	১৩১
সার-সংকলন	...	...	১৩৯
লুম্বিনি সম্বন্ধে	...	...	১৪৩

With compliments from :—

BABOO LAL & CO.

IRON & STEEL MERCHANTS

Structural Engineer & General Order Suppliers

76, AMHERST STREET, CALCUTTA-9.

Phone :— *Office* : 35-2828 ; *Res.* : 35-1531

চিত্ত

তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ॥
কার্ত্তিক-পৌষ, ১৩৬৮ ॥

মানসিক-স্বাস্থ্যের গোড়ার কথা

অসিতশংকর ভাদুড়ী, বি. এস্‌সি., এম. বি. বি. এস., ডি. পি. এম.*

আমাদের দেশে কোন নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যা নেই যা থেকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সংখ্যার পরিমাণ বোঝা যেতে পারে। কিন্তু স্পষ্টতই অনুমান করা যায় যে এই রোগে আক্রান্ত প্রচুর সংখ্যক রোগীর বিশেষজ্ঞের সাহায্য ও উপদেশের একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা খুব কম ক'রে ধরলেও জনসংখ্যার প্রতি হাজারে অন্তত দু'জন ক'রে পড়ে। আমেরিকাতে এর পরিমাণ হচ্ছে প্রতি হাজার জনসংখ্যায় ৫ থেকে ৮ জন, এবং ইংলণ্ডে প্রতি হাজারে তিন থেকে চার জন। যাই হ'ক, প্রতি হাজার সুস্থ ব্যক্তিদের ভিতরে কম ক'রে দু'জন মানসিক ব্যাধিগ্রস্তের সংখ্যা ধরলে মোট পরিমাণ খুব কম হয় না। তার মানে, অন্তত পক্ষে দশলক্ষেরও বেশী রোগীর মানসিক-হাসপাতালে-থেকে চিকিৎসার প্রয়োজন। এই সংখ্যার ভিতরে স্বল্পবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের ধরা হয় নি। এদের সংখ্যার পরিমাণ প্রচুর এবং ডাক্তারী ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় ধরনের চিকিৎসা এদের প্রয়োজন। এ ছাড়া আছে মৃগী রোগীর সংখ্যা। তাদের পরিমাণ প্রায় দু'শ জনসংখ্যায় একজন। আমাদের দেশে বর্তমানে মানসিক-চিকিৎসার যে বন্দোবস্ত আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। স্বল্পবুদ্ধি বা জড়বুদ্ধি ব্যক্তিদের ও মানসিক রোগীদের জন্য অন্তত পক্ষে বিশ লক্ষ রোগীর হাসপাতালে স্থানের প্রয়োজন। এই সংখ্যা থেকে মনোবিকার রোগীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের সংখ্যা ধরলে মোট স্থান দরকার ৬০ থেকে ৮০ লক্ষ রোগীর। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানসিক হাসপাতালে মোট বেডের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। জড়বুদ্ধিদের হাসপাতালে রেখে সুচিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসনের বিশেষ কোন

* মনোচিকিৎসক, শিক্ষা ও মনোবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা-সংস্থা, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ।

ব্যবস্থা নেই। এ ছাড়া আছে মনদেহী বা সাইকোসোমাটিক রোগীর দল; হাসপাতালে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা অপ্রতুল।

মানসিক স্বাস্থ্য—এই কথাটি ইওরোপে চালু হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এবং তার কয়েক বছর পরে চালু হয় আমেরিকায়। যে সমস্ত উপায় দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় তার মূলে কেবল বিশেষজ্ঞদেরই নয়, সেই সঙ্গে সমাজ সংস্কারক এবং উৎসাহী রাজনীতিবিদদেরও প্রচুর প্রেরণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ক্লিফোর্ড বিয়ার্স ও প্রফেসর এডল্ফ মেয়ার এই দুইজন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকাতে মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন নিয়ে আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন। এই সঙ্গে যাঁরা মানসিক রোগীদের উন্নতি নিয়ে আজীবন যুদ্ধ ক'রে গেছেন তাঁদের নাম না উল্লেখ করলে এই প্রবন্ধকে ক্ষুণ্ণ করা হবে; তাঁরা হচ্ছেন ইংলণ্ডের কনোলী, টিউক এবং লর্ড শ্যাফ্‌টসবেরী; ফ্রান্সের, পাইনেল, এস্‌কুইরল এবং ফেরাস; ভিন্ন আমেরিকাতে এবং পরে ইওরোপে।

ক্লিফোর্ড বিয়ার্স ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত আমেরিকার এক মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে ছিলেন। সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। রোগীদের যে কোনও সময়ে, কারণে-অকারণে, মারধোর করা হ'ত; গায়ে থুথু দেওয়া, তাদের লাথিমারা ইত্যাদি প্রায় দৈনন্দিন কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রয়োজন হলে রোগীদের হাত-পা বেঁধে একুশ দিন পর্যন্ত সমানে ফেলে রাখা হ'ত। রোগীদের সুখ-সুবিধার দিকে কিছুমাত্র নজর দেওয়া হ'ত না। এক কথায় তাদেরকে পশুর তুল্য গণ্য করা হ'ত। বিয়ার্স হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন, যে করেই হ'ক এই অবস্থার নিরসন করতে হবে। তিনি যে-আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন ধীরে ধীরে তা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। মানসিক ব্যাধিগ্রস্তদের মানুষ হিসাবে গ্রহণ করা শুরু হ'ল।

বিয়ার্স মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন আমেরিকার নিউ হ্যাভেনে। এক বৎসরের মধ্যে একটি জাতীয় কমিটি তৈরি হয় এবং বিয়ার্স তার সেক্রেটারী হন। এই কমিটির কার্য তালিকার ভিতরে ছিল জনসাধারণকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা এবং মানসিক রোগীদের জন্য উন্নত ধরনের চিকিৎসার ও ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণার বন্দোবস্ত করা। জনসাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা করা হ'ল যে এ ব্যাধি লজ্জাকর নয় এবং চিকিৎসা দ্বারা রোগমুক্ত হওয়া বা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে মানসিক-স্বাস্থ্য বিষয়ক আন্দোলনের উপকারিতা বোঝা গেল। শান্তির সময়ে মানসিক-ব্যাধির সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান প্রথম স্থান পেল।

১৯৩০ সালে ওয়াশিংটনে প্রথম আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় তিন হাজারেরও বেশী পঞ্চাশটি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা যোগদান করে। সভায় একটি স্থায়ী জাতীয় সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে প্যারিসে। তৃতীয় সভা হয় ইংলণ্ডে; এতে World Federation for Mental Health স্থাপিত হয় সংযুক্ত জাতি সংঘের (U. N. O.) World Health Organisation (W. H. O.)-এর সহযোগিতায়। ডাঃ জন্‌রীস (গ্রেটব্রিটেন) এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

মনোবিকারের সঙ্গে কয়েকটি অবস্থার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, যেমন—(ক) বংশ, (খ) বয়স ও যৌন তারতম্য, (গ) বিভিন্ন উচ্ছ্বাস বা ভাবের নানাবিধ দাবি বা চাপ,—বিশেষভাবে শৈশবাবস্থার

চাপ, (ঘ) সামাজিক কৃষ্টি আচার, বংশ ও অর্থনৈতিক প্রভাব, (ঙ) নানাবিধ শারীরিক ব্যাধি ও তার প্রভাব। সুতরাং মানসিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষার জন্যে এবং সেই সঙ্গে ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ ক'রে ব্যাধিমুক্ত হয়ে থাকতে গেলে অটুট, সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যপূর্ণ মানসিক অবস্থা গ'ড়ে তুলতে হবে।

অটুট মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী সেই হয় যে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় সংঘর্ষগুলোকে উপেক্ষা করে চলতে পারে। নানাবিধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট লোকের সঙ্গে এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে স্বাভাবিক জীবনযাপন ক'রে সে তৃপ্তি লাভ করে। ন্যূনতম ক্ষমতার সদ্ব্যবহার ক'রে সে নিজেকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং সমাজের গৌরবের কারণ হয়। সে তার ক্ষমতানুযায়ী যতটুকু প্রাপ্য তাতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং পরস্পরের সঙ্গে সুখকর সম্পর্ক বজায় রাখে।

বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্যের যেমন তারতম্য ঘটে, তেমনি ঘটে মানসিক স্বাস্থ্যের।

মানসিক-স্বাস্থ্য রক্ষার দুটো উপায় আছে। প্রথমতঃ, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট অসামঞ্জস্য-গুলোর প্রতিবিধান করা; এগুলো হচ্ছে আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা, খেলাধুলা ও আনুষংগিক আমোদ-প্রমোদ, যৌন স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও নানাবিধ রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সামান্য মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্যগুলোকে অতি অল্প আয়াসেই আয়ত্বে আনা সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, আরও কঠিন মানসিক বৈকল্যগুলোর প্রতিবিধান করা,—যে গুলোকে সাধারণত মানসিক ব্যাধি বা পাগলামী বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

মানসিক বৈকল্যের সমস্যাগুলো সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ গুলোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের রোগীরা সাধারণত সিফিলিস্ ও অন্যান্য বীজাণু-সংক্রান্ত ব্যাধি, মদ্যপান, মস্তিষ্কের টিউমার প্রভৃতি আঙ্গিক হেতু ঘটিত মানসিক ব্যাধিতে ভোগে। এই রোগগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্য কমবেশী জড়িত। সুতরাং মূল ব্যাধির চিকিৎসা করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ভাগের মানসিক ব্যাধি সম্পূর্ণ মানস সম্ভূত এবং এর কারণ শৈশবাবস্থায় নিহিত। আজকের মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিচয় লুকানো থাকে গতকালের ঘরকোনা, "অদ্ভুত"-ব্যবহার বিশিষ্ট, সন্দেহগ্রস্ত ছোট ছেলেটির ভিতরে। সুতরাং যদি ছোট বয়স থেকেই ছোট খাটো অসংগতিগুলোর প্রতিবিধান করা যায়, তা হলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মানসিক বৈকল্যের তীব্রতাকে শুধু কমানোই যাবে না, তাকে সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভবপর হবে।

এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার যে সমস্ত উপায়গুলো আছে সেগুলো প্রধানতঃ নজর দিয়েছে আমাদের শৈশবাবস্থার সুখ, শান্তি ও সুস্বাস্থ্যের উপরে। শিশুরাই জাতির জনক; এ শুধু মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দিয়েই নয়, যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে শিশুরা দেখে তাকেও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ছোটবেলাকার বিভিন্ন ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের বৈষম্যমূলক ভাবোচ্ছ্বাসগুলো আমাদের বুঝে তার সহজ প্রতিবিধান করতে হবে, কারণ এগুলোই ভবিষ্যতের মানসিক সুস্বাস্থ্য নিরূপণ করতে সাহায্য করবে।

এখন আমরা মানসিক ব্যাধির অন্যান্য কারণগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বংশ

পিতৃ-পিতামহ থেকে পরবর্তী বংশধরদের ভিতরে মানসিক ব্যাধি বর্তানো নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। মানসিক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত কোনও কোনও ব্যাধি যে নিশ্চিতরূপে কিছু সংখ্যক পরবর্তী বংশও ধরদের উপরে বর্তায় এ বিষয়ে প্রায় কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ প্রভাব আছে। বংশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়েই মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করার প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করে।

যৌন-ব্যাধি

শিশু যদি সহজাতভাবে (congenitally) যৌন রোগ পিতামাতার কাছ থেকে পায় তবে সাধারণত তারা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। বয়স্থ অবস্থায় এই রোগে আক্রান্ত হলে নানাবিধ মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা সাধারণত অসামাজিক, বিকৃতরুচি ও নিম্ন বা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। নানাবিধ ধাতু, যথা, সীসা, পারা, রূপা এবং থ্যালিয়াম, যখন ক্রমাগত শরীরে প্রবেশ করে তা' শরীরকে বিষাক্ত করে তোলে এবং বিভিন্ন গ্যাস্ বিশেষত:, কার্বনমনোক্সাইড যা কয়লাখনি বা নানাবিধ চুল্লী থেকে পাওয়া যায়—মানসিক রোগের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন ধরনের ওষুধ, বিশেষ ক'রে আফিং ও আফিংজাত অন্যান্য ওষুধ, গাঁজা, ভাঙ, পেথিডিন, মিথাডোন, কোকেন প্রভৃতি নানা ধরনের ঘুমের এবং উত্তেজক ঔষধাদি ক্রমাগত ব্যবহারে শরীর ও তার স্নায়ুমণ্ডলীকে বিষাক্ত ক'রে তোলে এবং তার ফলে বুদ্ধিভ্রংশ, অকারণ উত্তেজনা ও বিশেষ ক'রে চরিত্রের অবনতি ঘটে। বিভিন্ন শারিরীক ব্যাধি, যথা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, এন্‌কেফালাইটিস্, প্রভৃতি মানসিক রোগ তৈরী করে। এ ছাড়া আছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রোগ ও তা' থেকে সৃষ্ট রোগের বিষাক্ত প্রভাব। এর মধ্যে বিশেষ করে আসে দাঁত, টনসিল, পিত্তথলি, যকৃৎ ও যৌনাঙ্গের ব্যাধিগুলি। ডায়াবেটিস্, বাত, হৃদরোগ এবং ভিটামিনের অভাব থেকেও মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

শ্রান্তি ও ক্লান্তি শরীরের ইন্দ্রিয়গুলির শুধু অবসাদই ঘটায় না, সেই সংগে মানসিক পরিবর্তন, বিশেষত, বুদ্ধি ও ভাবের জগতে অবসাদের সৃষ্টি করে। তখন মেজাজের পরিবর্তন হয় এবং নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ বোধ হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় মানসিক পরিশ্রম ও তার ফলে অবসাদ ; নানা রকমের অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করা ও আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে শোক পাওয়া—বিবিধ মনের রোগের লক্ষণের সৃষ্টি করে ; যেমন, সদা উদ্বিগ্ন ভাব, বদমেজাজ এবং সদা অবসন্ন ভাব ইত্যাদি।

মাথায় আঘাত লেগে মস্তিষ্কের বিকার সৃষ্টি করতে পারে, এতে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। শরীরের অন্য যে কোন অঙ্গে আঘাত লেগেও মানসিক পরিবর্তন আনতে পারে।

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

সাধারণত অর্থনৈতিক, ব্যবসা সংক্রান্ত ও পারিবারিক অশান্তি এবং বিরক্তিকর, অশান্তিকর, ও অতৃপ্তজীবন যাপন, বিশেষ করে, অতৃপ্ত যৌন জীবন এবং আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক ইত্যাদি সংবেদনশীল ব্যক্তির ভিতরে মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি করে।

অনিশ্চিত উদ্বেগ ও শঙ্কাপূর্ণ শৈশবাবস্থা

যার প্রধান উৎপত্তি হয় পিতা-মাতা ও সন্তানের ভিতর অসন্তোষ ভাব-সম্পর্কের ফলে—তৈরী

করে স্পর্শকাতর সন্তান এবং সেই ভাব যুবক বয়স পর্যন্ত থাকে ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধি সৃষ্টির সহায়ক হয়। পিতা-মাতার স্নেহ ও ভালবাসার অভাবে যেমন অপরাধী সন্তান তৈরী হয়—অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত আদরে তৈরী হয় মনোবিকারগ্রস্ত বা neurotic যুবক। জারজ বা অবৈধ সন্তান, পিতামাতার মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদ, সংসারে দিবারাত্রি তিক্ত ভাষায় কলহ, দত্তকপুত্র, উদ্বাস্তু, অনাথ আশ্রম—এ গুলি স্বাভাবিক মানসিক ধারাকে পরিবর্তন করে অস্বাভাবিক করে তোলে।

কতকগুলি ব্যাধি পুরুষ সমাজের ভিতরে বেশী দেখা যায়—যেমন, মদ্যপান ও যৌন ব্যাধি জনিত রোগ। আবার স্ত্রী সমাজের ভিতরেই কেবল পাওয়া যাবে অন্তঃসত্ত্বা, প্রসবের পরেও ঋতু বন্ধের সময়ে কতকগুলি ব্যাধি। এ ছাড়া বিভিন্ন endrocrine গ্রন্থির বিশৃঙ্খল কাজের ফলে ও গ্রন্থির রোগে মানসিক বৈকল্য দেখা যায়।

শিশুর যৌন কৌতূহল ও তার গুরুত্ব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের সাধারণ ধারণা, শিশুমন ফুলের মত সুন্দর-নির্মল, নিষ্কলুষ। যৌনতার বিন্দুমাত্র ছোঁয়াচ সেখানে নাই। যৌবনের আগমনে যৌনজ্ঞান যেন মনে হঠাৎ আবির্ভূত হয়—তার আগে কিশোর মনে ছিটে ফোঁটা ধারণা থাকলেও অন্ততঃ শিশুমনে তার কোন চিহ্নই থাকে না! এ ধারণা কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত নয়। আসলে অতি শৈশবেই শিশুমনে যৌন বিষয়ে আগ্রহ দেখা দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিন বছর বয়সের আগেই। ফ্রয়েড বলেন: "Infantile sexual curiosity begins very early, sometimes before the third year."[১] কিন্তু অতি শৈশবেই শিশুমনে যৌনজ্ঞানের আবির্ভাব হলেও পরিণত মনের জ্ঞানের থেকে তার পার্থক্য আছে। তবু পরিণত ব্যক্তির যৌনজ্ঞান এই শৈশবের অপরিণত জ্ঞানেরই পূর্ণ পরিণতি। তাই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির যৌনজ্ঞান ও যৌনবোধের স্বরূপ শৈশবের যৌন আগ্রহ ও তার উপলব্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। সেই কারণেই শিশুর যৌন কৌতূহল মনোবিদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) প্রথমে শিশুর মনে স্ত্রী এবং পুরুষ লিঙ্গের ভিন্নতা সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকে না। স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ের লিঙ্গ একই রকম তার এই ধারণা থাকে। পিতামাতাকে সে লিঙ্গ বিষয়ে পৃথক ভাবে না। তা ছাড়া শিশু জড়বস্তুকেও লিঙ্গযুক্ত মনে করে। স্ত্রী, পুরুষ লিঙ্গের ভিন্নতা জ্ঞান শিশুর কাছে আসে অকস্মাৎ। হয়ত উলঙ্গ অবস্থায় সে কোনদিন তার বোন বা অন্য কোন খেলার সহচরীকে দেখে। দেখে যে তারই মত দেহধারী অপর একটি শিশুর দেহে তার মত লিঙ্গ নেই। সে স্থান সম্পূর্ণ সমতল। অথচ ইতিমধ্যে শিশু তার লিঙ্গটি দিয়ে স্বমেহন ক'রে তীব্র যৌন অনুভূতি ও আনন্দ লাভ করেছে। এবং যেই কারণে লিঙ্গটি তার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনি একটি প্রিয়বস্তু তার সহচরীর মধ্যে নেই—তা কেমন করে সম্ভব? শিশু যেন নিজেরই চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। তখন তার মনে সহসা এ রহস্যের একটা হদিস এসে দেখা দেয়। কিন্তু শিশুর পক্ষে তা অতীব ভয়াবহ কল্পনা। ইতিমধ্যে লিঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময় মা-বাবা তাকে শাসিয়েছেন: 'ওখানে বারবার হাত দিলে লিঙ্গ ছেদন করে দেওয়া হবে।' শিশু ভাবে, লিঙ্গ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্যেই বুঝি তার সহচরীর লিঙ্গটি ছেদন করে দেওয়া হয়েছে। আর এ সম্ভাবনা যে তার ক্ষেত্রেও রয়েছে—এই আশঙ্কায় শিশু বিহ্বল হয়ে পড়ে। শিশু মনের এই ভয়কে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন—'Castration anxiety'। এই ভয় বা উদ্বেগ শিশুর সুস্থ চরিত্রগঠনে অথবা তার মানসিক অসুস্থতা উৎপাদনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে শিশুর বাস্তববোধও ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে উঠে। এই বাস্তবতার আলোকে যদি শিশু উপস্থচ্ছেদের সম্ভাবনাকে অসার বলে দেখে নিতে পারে তাহলে অবশ্য এই আতঙ্ক চরিত্রগঠনে কোন ব্যাঘাত হানতে পারে না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সেই বাস্তবঘোষা সমাধান না হয়, সেখানেই বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপস্থচ্ছেদের হুমকি বাস্তব বলেই পরিণত বয়সেও মনে টিকে

১ Freud: A general Introduction to Psycho-Analysis, P. 278

থাকে। সেক্ষেত্রে চারিত্রিক নানা বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। লিঙ্গকে রক্ষা করার জন্য ব্যক্তি হয়ত লিঙ্গের সক্রিয় ব্যবহার একেবারেই ত্যাগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার চারিত্রিক সক্রিয়তা ব্যাহত হবে এবং উদ্যমহীন, নিষ্ক্রিয় চরিত্র হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিবাহ করতে অসম্মত হতে পারে। আর বিবাহ করলেও তার লিঙ্গ বিষয়ে নির্জ্ঞান আতঙ্কের দরুণ যৌন ব্যাপারে পৌরুষ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবেনা। আবার যেহেতু যৌন ব্যাপারে সক্রিয়তার সহিত জীবনের অন্যান্য সক্রিয়তা জড়িত, তাই এরূপ চরিত্রে সাহস, দৃঢ়তা, প্রভৃতি সক্রিয় গুণের অভাব ঘটবে। বাস্তবের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া সম্ভব হবেনা। জীবনে ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি প্রকট হয়ে উঠবে।

আবার এমনও হতে পারে যে, শিশু নারীকে 'লিঙ্গহীন পুরুষ' (castrated male) ভেবে তার প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধ ও বিরূপ হয়ে পড়তে পারে এবং লিঙ্গসম্পন্ন পুরুষের প্রতিই একান্তভাবে আকৃষ্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে জৈবিক প্রেরণা পেলে ব্যক্তির পক্ষে সমকামী হয়ে পড়া সম্ভব। ফ্রয়েড বলেছেন: "One residue of the castration complex in the man is a measure of the disparangement in his attitude towards women, whom he regards as having been castrated. In extreme cases this inhibits his object-choice, and, if reinforced by organic factors, it may result in exclusive homosexuality."[২]

স্ত্রীশিশুর ক্ষেত্রেও উপস্থচ্ছেদের সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু তার গতি প্রকৃতি ও ফলাফল বিভিন্ন। স্ত্রীশিশুও প্রথমে পুরুষশিশুর মতই নিজেকে পুংলিঙ্গসম্পন্ন কল্পনা করে। ক্লিটেরিসকে সে পুংলিঙ্গরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু ক্রমশঃ পুংলিঙ্গের তুলনায় তার ক্লিটেরিসের অপর্যাপ্ততা ধরা পড়ে। তখন সে নিজেকে লিঙ্গহীন (castrated) বলেই বুঝে থাকে। এই বোধের ফলে, পুরুষশিশুর তুলনায় নিজেকে তার হীন (inferior) মনে হয় এবং পুরুষের প্রতি ঈর্ষা জাগে। এই ঈর্ষার নাম লিঙ্গঈর্ষা বা Penis envy। কাজেই স্ত্রীশিশুর পুরুষশিশুর মত কোন উপস্থচ্ছেদের আতঙ্ক দেখা দেয় না কারণ পুরুষশিশুর ক্ষেত্রে যা সম্ভাবনা, তার শিশুবুদ্ধিতে, তার ক্ষেত্রে সে সম্ভাবনা ইতিমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। তাই আর আতঙ্কের কোন অবকাশ নাই। পুংলিঙ্গহীনতাকেই সে সিদ্ধবাস্তব বলে মেনে নেয় এবং পুরুষের ভাগ্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। এই লিঙ্গহীনতাবোধ জাতিগতভাবে পুরুষ ও নারীর চরিত্রগঠনে বিশেষ প্রভাবশীল। পুরুষশিশুর দৃশ্যমান, ঋজু, দীর্ঘ লিঙ্গ যেন পুরুষকে তার শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার আশ্বাস দেয়। তাই পুরুষের মধ্যে সাধারণতঃ বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের উপস্থিতি। কিন্তু নারীর ঐরূপ দৃশ্যমান, পরিণত লিঙ্গ না থাকার জন্যে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে সে নিশ্চয়তার আশ্বাস পায় না। সেই কারণে সাধারণভাবে পুরুষের তুলনায় নারীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব।

এছাড়াও লিঙ্গের অধিকারী হওয়ার দরুণ পুরুষশিশু নিজেকে স্ত্রীশিশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে এবং সেই নিরিখে ভবিষ্যৎ জীবনেও নারীকে হীনভাবে। নারীর তুলনায় পুরুষের সেই উৎকর্ষ বোধ পুরুষের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। খুব প্রকাশ্য না হলেও প্রতি পুরুষই এ বিষয়ে আবছাভাবে সচেতন। পুরুষের এই অভিমান সম্বন্ধে শমিলার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন: "বাসরে, ভালবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।"[৩]

২ Freud, Collected Papers, Vol. V, P. 258

৩ রবীন্দ্রনাথ, দুইবোন, পৃঃ ২২

পুরুষের বিরুদ্ধে নারীর চিরন্তন অভিযোগ : ‘পুরুষ নিষ্ঠুর, স্বার্থপর’। মনে হয়, নারীর এই সাধারণ অভিযোগের পিছনে তার নির্জ্জান মনের ‘লিঙ্গঈর্ষা’ ক্রিয়াশীল। নারীর যে লিঙ্গের অভাব, পুরুষের তাই নিয়ে গৌরব। তাই পুরুষ নারীর নিকট নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর।

যাই হোক পুরুষের ‘উপস্থচ্ছেদের আতঙ্ক’র মত নারীর ‘লিঙ্গ ঈর্ষা’-ও তার চরিত্র গঠনে বিশেষ প্রভাবশীল। লিঙ্গঈর্ষা থেকে স্ত্রী শিশুর মনে পুরুষ হবার একটি ইচ্ছা জাগে (wish to be a male)। এই ঈর্ষা ও ইচ্ছা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের রকমের উপর স্ত্রী চরিত্রের প্রকৃতি নির্ভর করে। পুরুষের সাথে একাত্ম হয়ে যদি নারী নিজের পুংইচ্ছা ভোগ করে নিতে সক্ষম হয় তাহলে আর পুরুষ হবার ইচ্ছা নারীর মধ্যে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে চারিত্রিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে না। ঐকাত্মের সাহায্যে যেহেতু তার পুরুষভোগ অনেকটা তৃপ্ত হয়, তাই পুরুষ হবার ইচ্ছা ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং লিঙ্গঈর্ষার তীব্রতাও কমে যায়। এর পরিবর্তে পুরুষের প্রতি সহৃদয় ভাব জন্মে ; ফলে নারীত্ব গ্রহণ ক’রে পুরুষের সহিত যৌনজীবন যাপন করা সম্ভব হয়। কিন্তু পুরুষের সাথে একাত্মতা সম্ভব না হলে, স্ত্রীশিশুর তখন স্বাধীনভাবে পুরুষ হবার ইচ্ছা প্রবল হয় এবং লিঙ্গঈর্ষাও অপরিবর্তিত থেকে যায়। ফলে এরূপ স্ত্রীলোক সাধারণতঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয় না। কারণ বিবাহে পুরুষের নিকট তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তাতে নিজের পুরুষত্বহীনতার কথাই প্রমাণিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা অসহনীয়। আর যদি এরূপ নারী বিবাহ করে তাহলে তারা পুরুষের উপর আধিপত্য করতেই বিশেষ সচেষ্ট হয় এবং নিজের পুরুষত্বহীনতার আক্রোশ স্বামীর উপর মেটাতে থাকে। সেক্ষেত্রে স্বামীর ভাগ্যে উৎপীড়ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার প্রাবল্য ঘটে। এই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার দ্বারা এরূপ স্ত্রী পুরুষের উপর নিজের লিঙ্গহানীর প্রতিশোধ তোলে। কার্ল আব্রাহমের মতে, পুরুষের উপর উৎপীড়নের গভীর অর্থ—পুরুষকে নিজের মত লিঙ্গহীন (castrated) করে দেওয়া। যা তার নিজের নেই তা থেকে পুরুষকেও বঞ্চিত করা।

এ ছাড়া এরূপ নারীর পুরুষোচিত আচার-ব্যবহার, বৃত্তি, পোষাক প্রভৃতির প্রতি তীব্র আসক্তি দেখা দিতে পারে। চরিত্রে নারীসুলভ কমনীয়তা, স্নেহশীলতার পরিবর্তে পরুষতা, কঠোরতা, গর্ব ইত্যাদির প্রাবল্য দেখা দেয়। এরূপ নারীর পক্ষে সমকামী (homosexual) হয়ে পড়াও অসম্ভব নয়। কারণ, নির্জ্জানের পুংইচ্ছার প্রাবল্যের দরুণ এরা যৌনজীবনে পুরুষভূমিকা গ্রহণেরই পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। ফলে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষভাবে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা জন্মে। অর্থাৎ এরূপ স্ত্রীলোক মানসিকভাবে পুরুষ হয়ে অপর স্ত্রীলোকের সহিত যৌনবিহারে আগ্রহশীল হয়। কার্ল আব্রাহমের মতে : “A considerable number of woman are unable to carry out a full psychical adaptation to the female sexual role. A···possibility is open to them in virtue of the bisexual disposition common to humanity—namely, to become *homosexual.* Such women tend to adopt the male role in erotic relations with women. They love to exhibit their masculinity in their dress, in their way of doing their hair, and in their general behaviour.”[৪]

আর যে সব ক্ষেত্রে সমকামিতা দেখা না দেয় সে সব ক্ষেত্রে অন্যরূপ যৌন বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমন ক্ষেত্র বিশেষে এরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষে যৌনঅনুভূতিহীন (frigid) হয়ে পড়াও সম্ভব।

৪ Karl Abraham, Selected Papers on Psycho-Analysis, P. 344.

কারণ, পুরুষ হবার ইচ্ছার দরুণ এরূপ স্ত্রীলোক যোনি অপেক্ষা ক্লিটরিসকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ক্লিটরিসটি তার নিকট পুংলিঙ্গের প্রতীকরূপে দেখা দেয়। তাই বয়োবৃদ্ধির সাথে যৌনঅনুভূতি যোনিতে স্থানান্তরিত না হয়ে ক্লিটরিসেই সংবদ্ধ (fixated) হয়ে থাকে। ফলে যৌন মিলনে এরূপ স্ত্রীলোক কোন উত্তেজনা বোধ করে না ও তৃপ্তি পায় না। ফ্রয়েড বলেছেন : “The clitoris in the girl, moreover, is in every way equivalent during childhood to penis ; it is a region of especial excitability in which auto-erotic satisfaction is achieved. In the transition to womanhood very much depends upon the early and complete relegation of this sensitivity from the clitoris over to the vaginal orifice. In those women who are *sexually anaesthetic*, as it is called, the clitoris has stubbornly retained this sensitivity.”[৫]

কাজেই স্ত্রীশিশুর পক্ষে নারীত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভের পক্ষে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ—উভয়ের স্বাভাবিকতা, তাদের নিজ নিজ গুরুত্ব, মূল্য ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। লিঙ্গ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব, বাড়াবাড়ি রকম মূল্য আরোপণ প্রভৃতি মানসিকতা স্ত্রী এবং পুরুষ শিশু উভয়ের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই অনিষ্টকর। এ বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান স্ত্রী এবং পুরুষ শিশু উভয়কেই সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বলাভে সাহায্য করে।

(২) শিশুর অপর গুরুত্বপূর্ণ যৌন কৌতূহল জন্ম রহস্যকে কেন্দ্র করে। আত্মপ্রীতি এবং আত্মসংরক্ষণবৃত্তি থেকেই এই কৌতূহলের আবির্ভাব। শিশু যখন পিতামাতার অকৃপণ স্নেহে লালিত পালিত হয় তখন হঠাৎ একদিন সংসারে এক নবজাতকের আবির্ভাব ঘটে। ফলে মায়ের আদর যত্ন, সেবাশুশ্রূষা সেই নবজাতকের উপর গিয়ে পড়ে। পিতাও ক্রমশঃ নবজাতককে আদর করতে থাকেন। কাজেই শিশুর ভাগ্যে হঠাৎ বঞ্চনা এসে পড়ে। তার একচ্ছত্র ভোগে অংশীদার এসে তাকে বিভ্রান্ত ক’রে তোলে। এই আত্মস্বার্থের বিপর্যয়কে কেন্দ্র ক’রেই শিশুর কৌতূহল দেখা দেয় : ‘কে এই নবজাতক ? কোথা থেকে এর আগমন ?’ তার অপরিণত বুদ্ধিতে এই সমস্যা সমাধানের সে আপ্রাণ চেষ্টা করে। প্রথমতঃ সে বয়স্কদেরে কাছে এই প্রশ্নের সমাধান চায়। কিন্তু তারা যে উত্তর দেন তাতে শিশুর কৌতূহল মেটে না। ইউরোপের পরিবার ও নার্সারীতে এ সম্বন্ধে শিশুকে বলা হয় : সারস পাখী জালের ভেতর থেকে নবজাতককে নিয়ে আসে। আমাদের দেশে বয়স্কদের বলতে শুনেছি : নবজাতক আকাশ থেকে পড়েছে। কিন্তু বয়স্কদের এ উত্তর শিশু সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করে। বয়স্কদের এরূপ মিথ্যা জ্ঞান শিশুকে আহত করে, সে নিঃসহায় বোধ করে এবং পিতা মাতার প্রতি তার অবিশ্বাসের এখানেই সূত্রপাত ঘটে। আর এখানেই শিশু প্রথম গোপনীয়তার সন্ধান পায়। যৌন ব্যাপারগুলি যে গোপনীয়, সে বিশ্বাস শিশুর এমনি করেই প্রথম জন্মে। শিশু তখন স্বাধীনভাবে এ সমস্যা সমাধান করতে চায়। শিশুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং পারিপার্শ্বিক তাকে সত্য পেতে খানিকটা সাহায্য করে। নবজাতকের আবির্ভাবের আগে শিশু মায়ের ক্রমশঃ উদরস্ফীতি লক্ষ্য করে। পশুপক্ষীদের প্রসবও লক্ষ্য করে। এই অভিজ্ঞতা থেকে সে সিদ্ধান্ত ক’রে ফেলে : মায়ের দেহের মধ্যেই শিশুর উৎপত্তি। এইভাবে জন্ম রহস্য সম্বন্ধে শিশুর গবেষণায় প্রথম সত্যের সন্ধান মেলে। কিন্তু এ জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এর পরেই

৫ Freud, A general Introduction to Psycho-Analysis, P. 278.

প্রশ্ন জাগে : মায়ের দেহের মধ্যে শিশু আসে কি করে? অপরিণত বুদ্ধিও সমকালীন বক্ত্রীয়কামের (orallibido) প্রভাবে শিশু সিদ্ধান্ত করে : খাদ্যের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে খাওয়ার ফলেই বুঝি নবজাতকের উৎপত্তি ঘটে। (রূপকথায় সন্ন্যাসী প্রদত্ত ফল বা শিকড় খেয়ে রাণীর সন্তান লাভের কাহিনীর মধ্যেও এই বিশ্বাসই টিকে আছে)। এ সময় যেহেতু শিশুর স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গের পার্থক্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না তাই স্ত্রী দেহের মত পুরুষ দেহেও বাচ্চা জন্মাতে পারে বলেই শিশু বিশ্বাস করে। আর যেহেতু সেই বয়সে যোনি সম্বন্ধে শিশুর কোন জ্ঞান থাকে না, তাই পায়ুকেই শিশু নবজাতকের নিষ্ক্রমণের পথ বলে ধরে নেয়।

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। ক্রমশঃ শিশু বুঝতে পারে যে খাদ্য নয়, সন্তান উৎপাদনে বাবার কিছু করণীয় আছে। কিন্তু সেই করণীয় সম্বন্ধে তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা হয় না। যদি এ সময় সে মা-বাবার মৈথুন দেখে ফেলে তাহলেও এই মৈথুনের সাথে সাথে সন্তানজন্মকে সে সম্পর্কিত করতে পারে না। কারণ মৈথুন তার কাছে প্রথমে পীড়নরূপে প্রতিভাত হয়। ক্রমশঃ এই জন্ম রহস্য সম্বন্ধে চিন্তাকালে সে সহজভাবেই নিজের লিঙ্গে উত্তেজনা বোধ করে, একটা আক্রমণাত্মক কিছু করার প্রেরণা বোধ করে ; আর এমনি সব আবেগ অনুভূতি থেকেই সে ধারণা করে যে সন্তান উৎপাদনে লিঙ্গের বিশেষ অংশ আছে। কিন্তু কি সে অংশ, তখনও তা শিশু স্থির করতে পারে না। যৌন সঙ্গমের স্বরূপ তখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়, কারণ স্ত্রী যোনি সম্বন্ধে তার তখনও ধারণা হয় না।

কিন্তু ইতিমধ্যে তার প্রসবদ্বার সম্বন্ধে ধারণা বদলে যায়। শিশু আর মলদ্বার দিয়ে প্রসবের কথা বিশ্বাস করে না। তখন সে ভাবে, বুঝি নাভিদেশ ছিদ্র করে শিশুকে বার করা হয়। অথবা দুই স্তনের মাঝামাঝি জায়গা থেকে বুঝি শিশুর আবির্ভাব ঘটে।

প্রায় দশ এগার বছরে শিশু আরও বাস্তব যৌনজ্ঞান লাভ করে। এ জ্ঞান আসে সাধারণতঃ সঙ্গীদের কাছ থেকে। সঙ্গীদের কেউ কেউ পারিবারিক শাসনের শিথিলতার দরুণ, অবাধ যৌন স্বাধীনতা পেয়ে থাকে। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কোন অবসরে স্ত্রীযোনির গোপন দর্শন ঘটে থাকে। আবার জন্ম জানোয়ারদের রাস্তাঘাটে সঙ্গম করতে বা প্রসব করতেও লক্ষ্য করে। ফলে স্ত্রী যোনি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট জ্ঞান পায়। এই জ্ঞানই অন্যান্য সঙ্গীদের কাছে সে বিতরণ করে এবং তাদের কাছে সে জ্ঞান বুদ্ধের স্থান দাবী করে। এইভাবে স্ত্রীযোনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ায়, শিশুর পক্ষে সঙ্গম ও সন্তান উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা অবশেষে সম্ভব হয়। যোনিদ্বার দিয়ে যে সন্তানের আবির্ভাব ঘটে এবং কেবল স্ত্রীদেহেই সন্তানের জন্ম সম্ভব তাও সে মোটামুটি উপলব্ধি করে থাকে। কিন্তু পুরুষ লিঙ্গ থেকে সঙ্গমকালে বীর্যপাত হয়ে যে নারীর দেহে সন্তানের উৎপত্তি ঘটে, এ ধারণা তখনও হয় না। সে জ্ঞান আরও পরিণত বয়সের ব্যাপার।

তেমনি স্ত্রীদেহের অভ্যন্তরের কি বৈশিষ্ট্য আছে যা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীকেই সন্তান ধারণে সক্ষম করে তা শিশু প্রথমে বুঝতে পারে না। ফলে নারীর এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি পুরুষ মন ঈর্ষান্বিত হয়। নারী করতে পারে পুরুষ পারে না, এই অক্ষমতা যেন পুরুষকে পীড়া দেয়। কিন্তু নারীর লিঙ্গঈর্ষার মত নারীর প্রসব ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরুষের ঈর্ষা তার চরিত্রে তেমন প্রকাশ্যভাবে দেখা দেয় না। তবে পুরুষের এই ঈর্ষা আদিম জাতির ক্ভেদ (couvade) প্রথা ও মনঃ সমীক্ষণকালে ব্যক্তির আবেগ-কল্পনা ও উদ্বেগের মধ্যে ধরা পড়ে। আদিমজাতের পুরুষেরা যেরূপ স্ত্রীর প্রসবকালে নিজেদেরও প্রসবরত ভেবে শয্যা নেয়,

কোন কোন ব্যক্তির মধ্যেও স্ত্রীর প্রসবকালে এইরূপ ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দেয়। এর কারণ অবশ্যই স্ত্রীর সৌভাগ্যের প্রতি নির্জ্ঞান মনের ঈর্ষা। সন্তান প্রসব ক'রে স্ত্রী সংসারে মহিমান্বিতা হবেন, পুরুষের যেন এতে বঞ্চনা বোধ হয়। তাই সাংকেতিকভাবে সেও স্ত্রীর মত প্রসব করে যেন স্ত্রীর সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চায়। জোয়ান রিভিয়েরার কথায় : "In analysis there come to light" in men wishes and phantasis to undergo a state of couvade, or symptoms which in effect cause them to do so at such times. These wishes and symptoms prove to be largely due to envy of their wives for being able to produce a live child and for being so much admired and treated as so important on account of it."[৬]

নারী যে পুরুষের কাছে 'চিররহস্যময়ী' তার মনস্তাত্ত্বিক কারণ, নারীর এই গর্ভধারণ ও প্রসবের ক্ষমতা যা পুরুষের নাই। যেহেতু গর্ভাধারণের ব্যাপার দেহের অভ্যন্তরে ঘটে তাই পুরুষশিশু সে প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। অপরিণত পুরুষশিশুর নারীদেহের অভ্যন্তর সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতাবোধই পরিণতকালেও নারীকে পুরুষের কাছে 'রহস্যময়ী' ক'রে তোলে।

কাজেই দেখা যায়, শিশু জন্মরহস্য সম্বন্ধে নানাভাবে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাস্তবজ্ঞান লাভ করে। তার মানসিক ক্রমপরিণতির এক এক স্তরে জন্ম সম্বন্ধে এক এক প্রকার সমাধান আবির্ভূত হয়। এই সত্য মিথ্যার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে শিশুকে বহু পরিশ্রমে বাস্তবজ্ঞান লাভ করতে হয়। কিন্তু কোন কোন শিশুর ভাগ্যে জন্ম সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না। শিশু মনের জন্মবিষয়ক নানা অপরিণত ও অবাস্তব তত্ত্বগুলিই পরিণত বয়সেও পাকাপাকিভাবে মনে টিকে থাকে। সে সব ক্ষেত্রেই নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যাধি দেখা দেয়।

মুখ দিয়ে খেয়ে গর্ভ হয় এবং পায়ু দিয়ে সন্তান জন্মে, শৈশবের এই অপরিণত ধারণা মনে টিকে থাকলে নানারূপ শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। যেমন পরিণত বয়সে ব্যক্তির খাদ্যে অরুচি ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। কারণ, খেলেই পেটে ছেলে জন্মাবে, মনে এই আতঙ্ক কাজ করার ফলে ক্ষুধা কমে যায় এবং খেলেও আতঙ্কের দরুণ ভাল হজম হয় না। অনেক সময় খাদ্যকে আতঙ্ক বশে মুখ দিয়ে বর্জন করার ইচ্ছা প্রবল হয়, ফলে বমি করার প্রবণতা দেখা দেয়। বুক জ্বালা করতে থাকে। পেটে ভার বোধ হয়। গেঁট ভার এবং বুক জ্বালার কারণ, রোগী মনে করে খাওয়ার ফলে বুঝি পেটে সন্তান এসে গেছে। আর অবাঞ্ছিত ভেবে তাকে দূর করার ইচ্ছা জাগে বলে বুকজ্বালা ও বমির আবির্ভাব ঘটে। পায়ু দিয়ে প্রসব হয়—এই ধারণা মনে টিকে থাকার দরুণ ব্যক্তি পায়ু এবং মলত্যাগ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকম স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে মলত্যাগ আর মনের কাছে মলত্যাগ থাকে না ; তা সন্তান প্রসবের রূপ নেয়। কিন্তু এটি অস্বাভাবিক ব্যাপার ও সামাজিকভাবে অশোভনীয় বলে মলত্যাগকে কেন্দ্র করে অতিমাত্রায় লজ্জা দেখা দেয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল অজীর্ণ, গ্যাসট্রিক আলসার প্রভৃতি পাচনতন্ত্র জনিত নানা রোগের কারণ শৈশবের এই ভুল বোঝার মধ্যেই নিহিত থাকে।

গর্ভাবস্থায় মেয়েদের মধ্যে যে বিবমিষা দেখা দেয় তার পিছনেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসিক

৬ Love, Hate And Reparation : Melanie Klein & Joan Riviere, P. 35.

কারণ বর্তমান থাকে। মুখ দিয়ে খেয়ে পাকস্থলীতেই বুঝি সন্তান জন্মেছে এবং সেই সন্তান কিছু বিপত্তি ঘটাতে পারে, অতএব বর্জ্জনীয়—এই অপরিণত চিন্তা থেকেই বমি করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। আর্নেষ্ট জোনস্ বলেছেন: "Much of the vomiting of pregnancy—I do not of course refer to phnicious vomiting of hepatic origin and the like—usually ascribed to reflex action has really a psychological origin in the unconscious effort to expel the foreign, and therefore 'bad' object."[৭]

কাজেই জন্ম রহস্য সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহলকে অবজ্ঞাভরে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর সে বিষয়ে গোপনীয়তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এ বিষয়ে বাস্তবজ্ঞান শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(৩) অপর যে বিষয়কে কেন্দ্র করে শিশুর কৌতূহল দেখা দেয় তা হল, পিতামাতার গোপন সম্পর্ক। শিশু এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখে। বাবা-মার পরস্পরের প্রতি আচার-ব্যবহার ও অন্তরঙ্গতা শিশুকে এ বিষয়ে কৌতূহলী ক'রে তোলে। কিন্তু শিশু এ বিষয়েও প্রথমে ভ্রান্ত জ্ঞানই পেয়ে থাকে। কোন অবসরে যদি বাবা-মার যৌন মিলনের গোপন দর্শন শিশুর ভাগ্যে ঘটে থাকে তা হলে শিশু এ ব্যাপারকে ভোগের ব্যাপার রূপে না বুঝে অত্যাচার, উৎপীড়ন রূপেই বুঝে থাকে। শিশু ভাবে, বাবা মাকে জবরদস্তি ক'রে উৎপীড়িত করছে। মার বস্ত্রে অথবা শয্যায় রক্তের চিহ্ন দেখলে এ ধারণা তার আরও দৃঢ় হয়। কাজেই দেখা যায়, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতায় স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলন অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহ ব্যাপাররূপেই প্রতিভাত হয়। ফ্রয়েডের কথায়: "If by chance he is witness of the sexual act he conceivés it as an attempt to overpower the woman, as a combat, the *sadistic misconception of coitus* ;.....if he discovers blood on the mother's bed or under-linen he takes it as evidence of injury inflicted by the father."[৮]

এরূপ ভুল বোঝার সম্ভাবনা পুরুষশিশুর ক্ষেত্রেই অধিক। কারণ তারা সঙ্গী সাথীদের সাথে ঝগড়া মারামারি প্রায়ই করে থাকে। একে অপরের উপর উপুড় হয়ে পড়ে মারধোর করে অন্যান্য শিশুরাও তা দেখে থাকে। এই সব অভিজ্ঞতার নিরিখেই অপরিণতবুদ্ধি শিশু সঙ্গমক্রিয়াকেও মারধোর বলে অনুমান ক'রে থাকে। এরূপ বিভ্রান্তির আরও কারণ, সেই বয়সের শিশুর স্ত্রী যোনি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। তার কাছে বাবা ও মার লিঙ্গের কোন প্রভেদ থাকে না। আবার নিজের যৌনবোধও পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে না। ফলে যৌনমিলনকে ভুলবোঝা প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর পক্ষে অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অবশ্য বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে এ ব্যাপারকে সে স্বাভাবিক ও বাস্তবরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তখন প্রাথমিক ভুল দূর হয়ে যায়। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এরূপ বাস্তবঘেষা সমাধান সম্ভব হয় না। তাদের মনের গভীরে অবাস্তব প্রাথমিক কল্পনাগুলিই স্থায়ীভাবে টিকে থাকে। সে সব ক্ষেত্রে মানসিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন স্ত্রীশিশুর মনে সঙ্গম সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা টিকে থাকলে মানসিক ভাবে তার নারীত্বে পূর্ণ পরিণতি লাভ সম্ভব হয় না। তার নির্জ্ঞান মনে সঙ্গম যেহেতু উৎপীড়নরূপে প্রতিভাত তাই পরিণত বয়সে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণে আতঙ্ক দেখা দেয়

৭ Ernest Jones : Papers on Psycho-analysis, Fifth ed., P. 388.

৮ Freud : A General Introduction to Psycho-Analysis, P. 297.

এবং পুরুষ সংসর্গ এড়িয়ে চলা কাম্য হয়ে থাকে। পুরুষকে ভয়াবহ, অনিষ্টকর ইত্যাদি মনে হয়। এ ছাড়া নারীর যে সমস্ত চারিত্রিক গুণ স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়ে থাকে, তার ক্ষেত্রে সেগুলির অভাব ঘটে। ফলে স্বাভাবিক জীবন যাপন দুরূহ হয়ে ওঠে।

পুরুষশিশুর ক্ষেত্রেও এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষের মধ্যেও নিষ্ক্রিয় যৌনদিক (Pssivity) আছে। এই দিককে নিষ্ক্রিয় সমকামিতা (Passive homosexuality) ও নারীত্ব (femininity) বলা হয়। সঙ্গম সম্বন্ধে প্রাথমিক ভীতি মনে টিকে থাকলে পুরুষের এই নিষ্ক্রিয় যৌন জীবন অপুষ্ট থেকে যায়। অর্থাৎ এরূপ পুরুষ মানসিকভাবে নিষ্ক্রিয় সমকামী বা নারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। ফলে জীবনে প্রয়োজনীয় নানা ক্ষেত্রে সমর্পণ বা বশ্যতা স্বীকারে অসুবিধা দেখা দেয়। তাতে ব্যবহারিক জীবন নানাভাবে ব্যাহত হয়। এরূপ পুরুষের চরিত্রে ধৈর্য, স্থৈর্য ও প্রশান্তির অভাব ঘটে এবং অত্যধিক উত্তেজনা, উদ্বেগ ইত্যাদি জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। অবস্থা বিশেষে আরো নানা প্রকার মানসিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কাজেই গোপনীয়তা পরিত্যাগ ক'রে এ বিষয়েও শিশুকে বাস্তব জ্ঞান দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

কৌতূহল দুরপনেয়। শিশুর বেলাতেও সে কথা সত্য। তাই কৌতূহল চরিতার্থ করাই যুক্তিযুক্ত। বিশেষ ক'রে যেখানে শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের অনেকখানি নির্ভর করে তার শৈশবের যৌনজ্ঞানের রকমের উপর সে ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মতভাবে এ সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। শিশুদের যে অন্যান্য বিষয়ের মত যৌন ব্যাপারেও জ্ঞান দেওয়া উচিত সে বিষয়ে মনঃসমীক্ষণ দৃঢ়মত। ফ্রয়েড বলেন: "A gradual and progressive cource of instruction in sexual matters... seems to me to be the only method of giving the necessary information that takes into consideration the development of the child and thus successfully avoids ever-present dangers."[৯] অনেকে মনে করতে পারেন যে শিশুকে যৌন বিষয়ে জ্ঞান দিলে সে অকালপক্ক হয়ে যাবে। এ ধারণা ভুল। আসলে প্রাপ্তবয়স্কদের এই আশঙ্কা তাদের যৌনতা সম্বন্ধে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষার পরিণাম। যৌনতা মানেই নোংরামি, অন্যায়—এমনি শিক্ষা তারা শৈশবে পেয়েছেন। সেই শিক্ষাই তাদের শিশুকে যৌন বিষয়ে জ্ঞান দানে ত্রস্ত করে তোলে। তাই যৌন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে গেলে কয়েকটি বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে: প্রথমতঃ, শিশুকে যৌনশিক্ষা দেওয়া মানে এই নয় যে তার যৌন চেতনাকে অনাবশ্যক উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়তঃ, শিশুকে যৌন শিক্ষা দিতে হলে শিশুর মত করেই দিতে হবে। শিশুর বুদ্ধি অপরিণত। কাজেই তার যৌন কৌতূহল এমন ভাবেই মেটাতে হবে যেন বিষয়টি তার বোধগম্য হয় এবং শিশু প্রদত্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, যৌনশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হবে, যৌনতাকে সহজ, স্বাভাবিক বিষয়রূপে শিশুকে বিশ্বাস করান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি দেহের যেমন বিভিন্ন চাহিদা আছে এবং বিভিন্ন অঙ্গ আছে, যৌন অঙ্গ এবং তৎসম্পর্কিত চাহিদাও যে ঐ অন্যান্যের মতই স্বাভাবিক সে সম্বন্ধে বলিষ্ঠ মতামত দেওয়া। যৌন বিষয়ে কিছু লুকোচুরি বা গোপনীয়তা করা ঠিক নয়। শিশুর যেন ধারণা না হয় যে সে এ বিষয়ে অভিভাবকদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে। এ ধারণা হলে সে আর যৌনতাকে সহজ, স্বাভাবিক রূপে গ্রহণ করতে পারবে না। সেটি গোপনীয় কিছু, শিশুর এই ধারণাই তখন বদ্ধমূল হবে।

৯ Freud : Collected Papers, vol 2, P, 43.

শিশু সম্পর্কে এ দায়িত্ব প্রাথমিক ভাবে অবশ্যই পিতামাতার এবং পরে শিক্ষায়তনের। কাজেই শিশুকে যৌনশিক্ষা দেওয়ার আগে পিতামাতার এবং শিক্ষক শিক্ষিকার এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া উচিত। তাদের অনেকের শৈশবের শিক্ষা এ কাজের অনুকূল নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার আগে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিজেদের যৌনবিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত। একমাত্র তখনই তাদের শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার অধিকার জন্মাবে। গৃহে পিতামাতা এবং শিক্ষায়তনে শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষা শিশুর বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে এবং অনেক মানসিক বিপর্যয় থেকে শিশুকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। দেশ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে পিতামাতা, শিক্ষাবিদ্, সমাজসেবী ও সরকারের এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য

শ্রীমতি সন্ধ্যা ভট্টাচার্য্য।

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" কথাটী শুধু কবির কল্পনা বিলাস নয়, অতি সত্য কথা। শিশুটী আজ ছোট আছে বলে যে সে চিরদিন ছোট থাকবে তাতো নয়,—দিনে দিনে এই কোলের শিশুটী বড় হয়ে দশের ও দেশের একজন হয়ে উঠবে। তার পৃথক ব্যক্তি-সত্তা গড়ে উঠবে। এই ব্যক্তিত্ব সে কি করে লাভ করে? আধুনিক মতত্ত্বে শিশুর ব্যক্তিত্ব কি ক'রে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তা নিয়ে বহু আলোচনা চলে আসছে—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

সে যাই হোক্, সাধারণতঃ শিশু যখন বড় হয়ে উঠতে থাকে তখন থেকেই তার ব্যক্তিত্বের গতি লক্ষ্য করলে পরিবারের কারুর না কারুর সঙ্গে তার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে—"টুকুন ঠিক্ ওর মাসীর মতন স্বভাবের হয়ে উঠ্‌ছে—" "বাবুয়া দেখ অবিকল ওর ছোট কাকার মতন হাব ভাব করছে," কিম্বা ঠাকুর্দ্দার মতন মিতব্যয়ী, দিদিমার মতন মিশুক, ইত্যাদি বড়দের বা মা বাবার কাছে খবর নিলেই শোনা যায়। অথবা এমনও শোনা যায় যে ছেলেটী দেখতে হয়ত বাপের মতন কিন্তু স্বভাবটী মায়ের মতন। এসব ক্ষেত্রে মা-বাবার ধারণা বংশের ধারা অনুযায়ী তাঁদের সন্তানের ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক চরিত্র গড়ে উঠবে।

অবশ্য এইসব চল্‌তি কথার গুরুত্ব যে কতখানি তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ বংশানুক্রম যে ভাবে সম্ভব হয় অর্থাৎ পুংবীজের সঙ্গে স্ত্রী ডিম্বের মিশ্রণে—তার ফলে প্রায় ১,০০০, ০০০, প্রকারের সন্তান হতে পারে। সুতরাং একটী শিশু কোনমতেই ঠিক তার বাবা, মা, ঠাকুমা ঠাকুর্দ্দা বা বংশের আর কারুর মত বিশিষ্ট গুণ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেনা, আর তা করা সম্ভব নয়। সে নিজেই একটী নতুন সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট নতুন সম্ভবনা। তবে তার মধ্যে পূর্ব পুরুষের বিশেষ গুণগুলি সুপ্ত ভাবে কিছু কিছু থাকা সম্ভব, আর তার ফলেই সে নতুন সংস্করণ রূপে দেখা দেয়।

তাহলে, শিশুর ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পক্ষে বংশগতিকে সর্ব্বাংশে দায়ী করা উচিত নয়, যদিও খানিকটা কাঠামো নিয়ে সে জন্মায়। তবে বেশীর ভাগ শিশুর আচার ব্যবহার তার শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। উপরোক্ত টুকুনের স্বভাব যে ওর মাসীর মতন তার কারণ এই নয় যে সে মাসীর মতন স্বাভাবটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে—তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে সে এই স্বভাবটি তার আসে পাশের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে আয়ত্ব করেছে। এই ভাবেই শিশুরা বদমেজাজী, শান্ত, ভদ্র, আলাপী, অবাধ্য, ধীরস্থির, ভীতু, সাহসী হয়।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে শিক্ষার এবং পারিপার্শিকতার গুরুত্ব স্বীকার করার পূর্ব্বে বংশগতির বিষয়টী আরও একবার আলোচনা করে দেখা যাক্।

অনেক মনিষীর ধারণা যে শিশুর জন্মের বহু আগে থেকেই পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সুরু হয়ে যায়। ভ্রূণটী মাতৃগর্ভে থাকা কালীনই একটী বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বড় হতে থাকে—জরায়ুর অবস্থান, আশে পাশের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রভাব, সে পায়। আবার এই প্রভাবও একই মায়ের বিভিন্ন সন্তানের

বেলায় এক থাকে না—তাছাড়া, মায়ের দৈহিক স্বাস্থ্য, রক্তের অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে পৃথক হতে বাধ্য। সুতরাং সেই গর্ভাবস্থা থেকেই শিশুর ব্যক্তিত্বের ওপর তার পারিপার্শ্বিকতা প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। অবশ্য এটা সত্য যে শিশু কতকগুলি বিশেষ দৈহিক গুণ নিয়ে জন্মায় যেমন—লিঙ্গ, চোখের রং, রক্তের বিশেষ প্রকৃতি ইত্যাদি। কিন্তু যাবতীয় অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে আশে পাশের সামাজিক পরিবেশ থেকেই লাভ করে।

মানুষের জীবন গঠনে বংশগতি (Heridity) এবং প্রতিবেশ (environment) কার প্রভাব কতখানি তা পরীক্ষা করবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল জমজ (identical twin)-দের ওপর পরীক্ষা চালান। একটী স্ত্রী ডিম্ব বিভক্ত হয়ে এই জমজের সৃষ্টি হয় সুতরাং এদের বংশগতি একই হবে ধরে নিলে কোন আপত্তি হবে না; বাহ্যিক সাদৃশ এক হবেই—লিঙ্গও একই হয়। এই জমজদের ওপর প্রতিবেশের প্রভাব পরীক্ষা করা গর্ভাবস্থা থেকেই সুরু হয়—ওজনে প্রায়ই পার্থক্য দেখা যায়—চোখের দৃষ্টি শক্তি, প্রভৃতিতেও অনেক সময় পার্থক্য দেখা যায়। এটা গর্ভাবস্থায় তাদের অবস্থানের জন্য হয়ে থাকে।

প্রতিবেশ দুজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ক'রে দেখা গেছে—তার প্রভাব তাদের বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হচ্ছে—এবং তাদের ব্যক্তিত্বও ভিন্নতর রূপে গড়ে উঠছে। অথচ উভয়ের ক্ষেত্রেই বংশগতি হুবহু এক। দেখা গেছে যে সন্তানটী ভাল প্রতিবেশের মধ্যে লালিত হচ্ছে তার Intelligent Quotient বা বুদ্ধাঙ্ক নিরেশ প্রতিবেশে লালিত শিশুটীর বুদ্ধাঙ্ককে ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে। তবে দেখা গেছে বুদ্ধির চেয়ে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রেই পারিবারিক প্রতিবেশের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক।

তাহলে দেখ যাচ্ছে শিশুর ব্যক্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে শিক্ষালব্ধ জিনিষ। এটা প্রধানতঃ (১) শিশু তার পারিবারিক প্রতিবেশ থেকে যে সামাজিকতা শিক্ষা করে তার ওপর এবং (২) এই শিক্ষার ফলে তার আবেগের ও তার নিজের উপযোজন (adjustment)-এর উপর নির্ভর করে।

শিশু তার জীবনের প্রথম ৫।৬ বছর পর্য্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই সময়টাই তার তার পক্ষে যা কিছু শিক্ষার সময়। এ সময় সে তার পিতামাতার কাছ থেকে আবেগ সম্বন্ধে কিরূপ প্রতিক্রিয়া করা উচিত অনুচিত তা শিক্ষালাভ করে। সুতরাং এই সময় খুব সাবধানতার সঙ্গে শিশুর মানসিক গতি প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি সহায়তা করাই প্রত্যেক পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই ক'টী গুরুত্বপূর্ণ বৎসরের ওপরেই শিশুটীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—একথা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে শিশু নিজের দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দ নিয়েই মত্ত থাকে এবং তার নিজের খুসীমতন কাজ করতে চায়। পিতামাতা তাদের শিশুটীকে সমাজের একজন হয়ে উঠুক এটাই চান সুতরাং তাঁরা সেই মত তাকে শিক্ষা দিতে সুরু করেন। এই সামাজিকতার নিয়ম কানুন শিক্ষা করা শিশুর পক্ষে বেশ শক্ত আর বিরক্তিকর মনে হয়—এগুলি তার আত্মকেন্দ্রিক (egocentric) সুখানুভূতির প্রতিবন্ধক বলে মনে হয় এবং সে অবাধ্যতা করতে সুরু করে তার আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে। এবং যখনই সে মনে করে যে এই কাজটা তার দৈহিক বা মানসিক সুখের প্রতিবন্ধক হচ্ছে তখনই সে সেটি করতে অসম্মত হয় এবং নানান্ ভাবে সেটি প্রকাশ করে।

যেমন ধরুণ প্রত্যেক মা চান যে তার শিশুটী ৮।৯ মাস থেকে মাতৃস্তন পরিত্যাগ করুক, ১½ থেকে ২

বছরের পর থেকে সে নিজে নিজে বাহ্যে প্রস্রাব করতে শিখুক; ২।৩ বছরের পর থেকে সে যেন তার যৌনাঙ্গ নিয়ে না খেলা করে। জিনিষপত্র ভাঙ্গা, জামাকাপড় নোংরা করা এসব ৫।৬ বছরের পর থেকে কোন মা চান না। ভাই বোনের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করা এবং অন্যান্য বদ স্বভাবগুলি যাতে অবিলম্বে দূর হয় তার জন্য প্রত্যেক মা বাবার চিন্তার আর শেষ নেই। কিন্তু এই সব ভাল গুণ যা তারা তাদের সন্তানের চরিত্রে প্রতিফলিত দেখ্‌তে চান সেগুলি করানোর জন্য অসীম ধৈর্য্য এবং প্রক্ষোভজ উপযোজন (emotional adjustment) শিক্ষা দেওয়া দরকার।

এটার জন্য শিশুর দৈহিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত দরকার। যেমন, একটী শিশু যদি খিদের সময় খাবার না পায় তবে তার মনে একটা স্বাভাবিক ভীতির সৃষ্টি হবে এবং তার মনে হবে সে হয়ত কোনদিনই ভালকরে সময় মত খেতে পাবে না এবং আঙ্গুল চোষা ও অন্যান্য কোন বাহ্যিক লক্ষণ সুরু হবে। আর এই স্বভাব সে বড় বয়স পর্য্যন্ত ছাড়তে পারবে না। অতি শিশু অবস্থায় কিম্বা পরবর্ত্তী ভাইবোন জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে মাতৃস্তন দানে বঞ্চিত করলে তার বিভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

শিশুদের আরও একটী কষ্টসাধ্য শিক্ষাদান হচ্ছে তাকে নিয়মিত এবং নিজে নিজে বাহ্যে প্রস্রাব করান। এটা শিক্ষা করার ওপর তার ব্যক্তিত্ব যথেষ্ট পরিমানে নির্ভর করে এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বহু ক্ষতি সাধিত হয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে এবং তাদের মনের মত ক'রে শিক্ষা দেওয়া দরকার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মায়েরা তার শিশুকে খুব ছোটবেলা থেকেই অর্থাৎ যখন তার শেখবার বয়স হয়নি তখন থেকেই পায়খানায় বাহ্যে প্রস্রাব করানো শেখাতে চেষ্টা করেন; এটা তার দৈহিক অপরিণত অবস্থায় করানো হচ্ছে সেকথা বোঝেন না, ফলে শিশুর মনে ভয় এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং এটা দেহের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকর মনের পক্ষে ত বলাই বাহুল্য।

পরবর্ত্তী কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ শিক্ষাদান হচ্ছে শিশুটীকে জিনিষ পত্রের প্রতি যত্ন নিতে শেখান।

যে কোন ভাল অভ্যাস শিক্ষাদানের আগে লক্ষ্য করা দরকার যে—যেটা শেখান হচ্ছে সেটা গ্রহণের মত শিশুদের মানসিক অবস্থা হয়েছে কিনা। একটী ভাল অভ্যাস করা মানেই অন্য একটী অভ্যাস সে ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে এবং এটার জন্য সময় দরকার, অধৈর্য্য হলে চলবে না। যে অভ্যাসটি সে মাসের পর মাস ধ'রে ক'রে আসছে সেটাকে হঠাৎ ছাড়ানর চেষ্টা না করাই ভাল। বাবা মা'র কাজ হচ্ছে তার শিশুকে ভাল অভ্যাসগুলো শিক্ষা করতে সাহায্য করা—যাতে তার মানসিক অবস্থা সমাজের পক্ষে অনুকূল হয়ে গড়ে ওঠে।

সমাজ-মন

গোপী বল্লভ সাহা, এম. এস্‌সি.*

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে মানুষে মানুষে ভাব-বিনিময়ের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

'সমাজ' কথাটার মূলেই রয়েছে পারস্পরিক সম্বন্ধ। জর্জ এইচ.-এর কথায় বলা চলে—সমাজ, 'সামাজিক ক্রিয়াকলাপের' উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল।

সামাজিক ভিত্তি গ'ড়ে উঠেছে সমষ্টির সঙ্গে ব্যষ্টির মিলনে বা ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি গঠনে। বহুর সঙ্গে একের যে মিলন এতে উভয় দিকেরই পরিবর্তন আসে এবং এই পরিবর্তনই নির্ধারণ করে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ। বস্তুতঃ একজন মানুষের সঙ্গে অন্যের যে সম্বন্ধ এটাই হ'ল সামাজিকতার প্রাথমিক স্তর স্বরূপ। সমষ্টির সাথে ব্যষ্টির মিলনে যে সামাজিক কাঠামো তৈরী হ'ল এর বাইরে ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের কোন মূল্যই নেই।

আমরা যদি মানবজীবনের প্রথম উন্মেষ থেকে দেখি তাতে প্রথমেই আমাদের নজর পড়বে স্নেহময়ী মায়ের কোলে ছোট্ট নবজাত শিশুটি পৃথিবীর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। ঐ যে ক্ষুদ্র শিশুটি মায়ের কোল জুড়ে রয়েছে তার সঙ্গে মায়ের যে সম্বন্ধ সেটাই হ'ল সামাজিক জীবন বিকাশের সর্ব্বপ্রথম ধাপ। জন্মের প্রথম দিন থেকে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের কার্যকলাপ, তার ভাব বিনিময়ে এবং তার ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীন জীবন তার গোষ্ঠীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

মানুষের সামাজিকতা নির্ভর করবে সে সমাজের প্রভাবের সঙ্গে নিজেকে কতখানি মানিয়ে নিতে পেরেছে তার উপর। এই মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে যারা কুশলী, কূটনৈতিজ্ঞ প্রভৃতি তারাই বিশেষ পারদর্শী।

অলপোর্ট ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন সমাজ জীবনের সঙ্গে উপযুক্তভাবে মানিয়ে নেওয়াই হ'ল ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিদর্শন।

সভ্য মানব সমাজে মানিয়ে নিতে হলে ব্যক্তির চারিদিকে সামাজিক বস্তুর উপরই শুধু মাত্র লক্ষ্য করলে চলবে না। গোষ্ঠী জীবনের পক্ষে যে সমস্ত আচার ব্যবহার প্রয়োজনীয় সেগুলিকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। সামাজিক পরিবেশ অনুযায়ী শিশুর আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবকে পরিবর্তিত করাও বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়।

এইভাবে আত্মগঠনকেই বলা হয় মানুষের সমাজ-মন গঠন। শিশু জন্মের পরে যে পরিবেশের মধ্যে আসে সেইটাই তার আগামী দিনের সামাজিক পরিবেশ। জন্মের অব্যবহিত পরে অবশ্য শিশুকে সামাজিক বা অসামাজিক কিছুই বলা চলে না। জন্ম থেকেই শিশু কতকগুলি অস্ফুট শক্তির অধিকারী থাকে যার ফলে সে যাবতীয় কর্মের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। জীবনের প্রথম দিকে শিশুর কর্মজগৎ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তার কর্মক্ষমতাও থাকে খুবই সীমাবদ্ধ।

* মনোবিদ্যার উপাধ্যায়, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম।

শিশুর অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি ক্রমশঃই বিশেষভাবে সংশোধিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে। ধীরে ধীরে শিশুর ইন্দ্রিয় স্থান সমূহ যতই অনুভূতিশীল ও কার্যোপযোগী হয়ে ওঠে ততই তাদের উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা শিশু দিনের পর দিন তার সামাজিক মন গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সে সামাজিক অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে শেখে। শিশুর সামাজিক পরিকল্পনা বুঝতে হলে এবং তার বর্তমান সামাজিক গঠন সম্বন্ধে জানতে হলে নতুন পরিবেশে শিশুর কি ব্যবহার এটা দেখলেই শুধু চলবে না তার স্থায়ী পরিবেশ হিসাবে নিজগৃহ বা পরিবার, বিদ্যালয় প্রভৃতির উপরও নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সামাজিক অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী।

জন্মের সময় বা জন্মের ঠিক পরে শিশু শারীরিক স্নোদনার দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। শিশুর পরিবেশ থেকেই তার প্রাথমিক স্নোদনার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়ে থাকে।

মহামতি সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মতানুযায়ী শিশুর মন প্রথমে থাকে যৈবিক চাহিদাপূর্ণ, তার সকল কাজের মধ্যেই থাকে চাওয়া ও পাওয়া। আত্মকেন্দ্রিক শিশু তার অনন্ত চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে খুঁজে ফেরে তার মনের তৃপ্তি। তখনও শিশুর বিচার ক্ষমতা আসেনি—ইচ্ছার পরিতৃপ্তিই তখন তার প্রধান লক্ষ্য থাকে, তাই আগুন দেখে শিশু হাত বাড়িয়ে দেয়, সাপ দেখে ধরতে যায়। এই ইচ্ছাপূরণের সঙ্গে বাস্তবের কোনও জ্ঞান তখন শিশুর থাকে না। এই যে জৈবিক চাহিদা যা শুধু পরিতৃপ্তিই কামনা করে এইরকম নগ্ন কামনা বাসনা নিয়েই মনের প্রথম অধ্যায় গঠিত—যার নাম দেওয়া হয় অদস্‌ (Id)। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অদস্‌ থেকে সৃষ্ট হ'ল অহম্‌ (Ego)-এর। অহম্‌ হ'ল আত্মজ্ঞান। অহম্‌ জৈবিক চাহিদার পরিপূর্ণতা সাধনে বিচার প্রয়োগ করে। সে বাস্তবের স্বরূপ জানে তাই শিশুর আগুনে হাত দেওয়ার যে নগ্নকামনা তাতে হাত পুড়ে যাওয়ার বেদনা বোধের যে জ্ঞান তাই থেকে অহম্‌ তার সেই ইচ্ছা পূরণের পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। অহম্‌ই হল মনের পরিচালক।

তারপর শিশু আরও বড় হয়ে পারিবারিক ও জাগতিক সংস্কারাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে এবং নিজেকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে শেখে। মানব মনের এই অধ্যায়ের বিকাশই হ'ল অধিশাস্তার (Super Ego) বিকাশ।

অহম্‌ এবং অধিশাস্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অদস্‌ অর্থাৎ জৈবিক চাহিদা ক্রমশঃ সংযত হতে থাকে।

দীর্ঘ শৈশবকালে শিশুকে তার পিতা মাতার উপর সম্পূর্ণ ভাবেই নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং পরবর্ত্তীকালে শিশুর অহমের মধ্যে পিতামাতার প্রভাব দীর্ঘদিনই স্থায়ী থাকে।

অধিশাস্তার বিকাশের মূলেও পিতামাতার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

অধিশাস্তার বিকাশের ফলে অহম্‌কে অদস্‌, অধিশাস্তা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব জগৎ সকলেরই সমানভাবে সঙ্গতি বিধান করতে হয়। অহমের কাজই হচ্ছে সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং এই সুসমন্বয়ই মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক জীবনের নির্দর্শন।

সামাজিক ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যাপারে অহম্‌ এবং অধিশাস্তা সম্পূরক এবং এরা সকলেই একই সামাজিক পরিবেশ থেকে সৃষ্ট হয়।

শিশুর প্রতি অন্য সকলের যে অবিরাম প্রতিক্রিয়া তা থেকেই শিশুমনে নিজের নিরাপত্তার

একটা জ্ঞান আসে এবং সে জ্ঞান বা ধারনাই শিশু নিজে অন্তঃক্ষেপ করে। এই অন্তঃক্ষেপর সাহায্যে তার নিজের কর্তব্য এবং অন্যের সম্বন্ধে তার কর্ম ও ধারনার ভিত্তি নির্দ্ধারিত করে থাকে।

আত্মপ্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান এই তিনটি হ'ল অহং বা আত্মা (self) গঠনের মূল উপাদান। এই গুলির উৎপত্তি ও বিকাশের পথেও পারিপার্শ্বিক প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বোঝবার ক্ষমতা বাড়ে তখন পারিপার্শ্বিক লোকেদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে তার একটা ধারণা জন্মে। সে যা অন্যের কাছ থেকে শিখেছে তা থেকে সে তার মনের সামাজিকতার একক গড়ে তোলে। শৈশবাবস্থার প্রথম দিকে অন্যান্য লোকদের আচার ব্যবহার তার মানসিক গঠনকে বিশেষ সাহায্য ও প্রভাবিত করে। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে তার মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে মনে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং এর দ্বারা সে সামাজিক ব্যবহারাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সচেষ্ট হয়।

শিশুর অসহায় অবস্থা থেকে সামাজিক জীবনের কৃতকার্যতার সঙ্গে বাস করতে পারাকেই বলা চলে সামাজিক পরিপক্কতা বা সমাজ মনের প্রকৃত বিকাশ।

সামাজিকতার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদের মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে সামাজিকতা মানব জীবনের একটি অপরিহার্য অবস্থা।

সমাজ মনের বিকাশ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যেমন-সমাজ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, পরিচয় ও পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা, স্থল, ও স্থলের বাইরে বিভিন্ন সুযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

যাতে শিশুর অন্তর্বেগ যূথ চরিতা (gregariousness), প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) এবং সাফল্যের (success) মধ্যে দিয়ে পরিতৃপ্ত হয় তার জন্য তাকে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

সমাজের সংস্কার ও উন্নতির মূলে রয়েছে মানুষের সমাজ মনের উপযুক্ত গঠন ও বিকাশ এবং সমাজ জীবনের সঙ্গে নিজেদের সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে নেওয়া।

আদর্শ সমাজ মন গঠনই আদর্শ সমাজ গঠন।

সুখ-দুঃখ ও বাস্তব

(২)

তরুণ চন্দ্র সিংহ ডি, এস্ সি.

গত সংখ্যা চিত্ত পত্রিকায় সুখ-দুঃখ ও বাস্তব সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে যে কথা বলিয়াছি তাহারই সূত্র ধরিয়া এই বিষয় আরও কিছু বলিব। গত সংখ্যায় বলিয়াছি কোনো কিছু হইতে সুখ পাইতে হইলে সেই বিশেষ বিষয় বা অবস্থা সম্বন্ধে আমার পাইবার বা ভোগ করিবার ইচ্ছা থাকিতে হইবে এবং সে ইচ্ছা পুরণ হইতে হইবে। তবেই আমার সুখ হইবে। আমার ইচ্ছা যত তীব্র হইবে তাহার পুরণে সুখ বোধও তত বেশী হইবে।

এই উক্তিগুলিকে একটু বিস্তৃত ভাবে দেখিবার চেষ্টা করি। ইচ্ছা না থাকিলে সে ইচ্ছা পুরণ হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আমি আমার সকল ইচ্ছা কি জানি? আমি কি চাই তা কি আমি ঠিক ঠিক জানি বা নিজেই তাহা বলিতে পারি? যে সকল ইচ্ছা আমার সজ্ঞান মনে সহজ ভাবে উঠিতে পারে সে ইচ্ছাগুলি আমি কিছু পরিমাণে জানি বলিতে পারি। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ রূপ অনেক সময়ই আমার জানা থাকে না। যেমন আমি যে লেংড়া আম খাইতে ভালবাসি বলিয়াছিলাম সে ইচ্ছাটাই একটু বিচার করিয়া দেখি। যে কোনো লেংড়া আম হইলেই আমার তৃপ্তি হয় না, তাহার মধ্যেও আবার স্বাদের বৈশিষ্ট আছে। সে আমের রূপ অর্থাৎ আয়তন, গঠন, বর্ণ, মশ্রিনতা, আঁটির বড় ছোট ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি আছে যে গুলি সব না মিটিলে আমার পেট ভরিলেও মন ভরে না। তবেই দেখুন আরেক জটিলতার সৃষ্টি হইল। যদিও বা মনের মত জিনিষটি পাইলাম তার সঙ্গে মনের মত পরিমানটুকুও পাওয়া চাই। পেট ভরিয়া লেংড়া আম খাইতে ইচ্ছা থাকিলে যদি মাত্র দুই চার টুকরা আম আমাকে দেওয়া হয় তবে আমার ইপ্সিত বস্তু পাইয়াও আমার মনের চাহিদা মিটে না বলিয়া সুখ পূর্ণ হইল না। অনেক সময় সামান্য পাইয়া লালসা বাড়িবার ফলে অতৃপ্তি ও অস্বস্তি বোধই বাড়ে, সুখ হয় না। আরও জটিলতা আছে। মনে করুণ আমার পছন্দ মত লেংড়া আমই আমাকে দেওয়া হইল, পরিমানও আমার চাহিদা মত পাইলাম কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে আমাকে আম খাইতে দেওয়া হইল বা যে পাত্রে দেওয়া হইল তাহা যদি আমার মনে সন্তোষ না জাগাইতে পারে তবে আমার আম খাইয়া সুখ হইবে কি? সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা চলে যে আমি সুখী হইব না। কিন্তু আমার মন যদি অন্য পারিপার্শিকের দিকে নজর না দিয়া অপরিষ্কার পাত্র বা স্থানের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল মাত্র আমটার দিকেই নজর দিয়া চলে, তবে হয়ত সে অবস্থায় সুখ বোধ হইতেও পারে। কিন্তু যদি অন্য দিকেও আমার মন যায় তবে সে সুখ আমি পাইব না। আরও আছে। শ্যামবাবু আমাকে চুচক্ষে দেখিতে পারেন না। সময়ে অসময়ে যেখানে সেখানে আমার নিন্দা করিয়া থাকেন এবং সাধারণ ভাবে তিনি আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। এই শ্যামবাবু যদি আমাকে ভাল লেংড়া আম খাইতে দেন তবে আমি সুখী হইতে পারিব কি? অবস্থাটা আরও খারাপ হয় যখন সরিকের ঝগড়ার ক্ষেত্রে এই আম খাওয়ার উপলক্ষ আসে অথবা সতীনের সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থা হয়। আবার ইহার বিপরীত অবস্থা হয়

যখন আমার অতিপ্রিয়জন আমাকে আমটা খাইতে দেয়। আমার ছোট্ট মেয়ে যদি আদর করিয়া তাহার ছোট্ট হাতে খুসিতে এক টুকরা আম আমার মুখে তুলিয়া দেয়, সে আম লেংড়া বা বোম্বাই হোক বা লেংড়ার শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর না হোক আমার ঐ এক টুকরা আমে যে সুখ হইবে সে সুখ পেট ভরিয়া বাছাই করা লেংড়া আম খাইলেও হইবে কি? তাহা ছাড়া আমার লেংড়া আম খাইবার ইচ্ছা আছে বলিলেও সে ইচ্ছা যে সকল সময় বা সকল অবস্থায় সমান প্রবল থাকে তাহা নহে। পেট ভরা থাকিলে, মনে অন্য কারণে কোনো দুশ্চিন্তা থাকিলে বা বেদনা বোধ থাকিলে ঐ অবস্থায় আমার সাধের লেংড়া আমও আমাকে সুখ দিতে পারে না। একবার একগ্রামে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বহুলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। নানা শ্রেণীর লোক আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সাধারণভাবে পরিবেশনের কাজ ও কাহার কি প্রয়োজন ইত্যাদি দেখিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। এক দলে এক বৃদ্ধ বসিয়া খাইতেছিল। অনেকেরই তখন খাওয়া শেষ হইয়াছে। কাহারও কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছি। সকলেই অনেক খাওয়া হইয়াছে, খুব খাওয়া হইয়াছে, আর কিছু চাই না বলিতেছিল। ঐ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল "আজ্ঞে আমাকে দেয় নাই"। মনে করিলাম হয়ত পরিবেশকগণ ভুলক্রমে দুই এক পদ খাদ্য দেন নাই। কি চাই জিজ্ঞাসা করিতেই বলিল "একটু পেলে খেতাম", মাছ দেওয়া হইল, খাইল। আর কি চাই জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে পাশের অন্য লোকেরা হৈ হৈ করিয়া উঠিল—সকলেই বলিল আর খাইলে বৃদ্ধ পেট ফাটিয়া মরিবে, কলেরা হইবে, রাক্ষস ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহাদের নিষেধ করিয়া বৃদ্ধকে তাহার ইচ্ছামত পট ভরিয়া খাইতে বলিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহকে দৈ মিষ্টি দেওয়াইলাম। অন্য সব খাওয়ার পরে বৃদ্ধ যে পরিমান দৈ মিষ্টি খাইল তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার ইচ্ছামত খাওয়া হইয়াছে কিনা জানিতে চাওয়ায় সে তখন বলিল একমত হইয়াছে তবে যদি কিছু মাছ, তরকারি, লুচি আর দৈ মিষ্টি তাহাকে দিয়া দেওয়া হয় তবে রাত্রে সে চারটিখানি খাইতে পারে। তাহাকে যথেষ্ট পরিমানে ঐসব খাদ্য দেওয়া হইয়াছিল। অন্য লোকেরা তাহাকে লোভী, খুসি হয় না ইত্যাদি নানা ভাবে তিরস্কার করিতেছিল। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে তখনকার মত তাহার পেট ভরিয়াছে কিন্তু লোকেরা তাহাকে যে ভাবে নানা কথা বলিতেছিল তাহার ফলে খাওয়ায় তাহার সুখ ছিল না। আর কয়দিনই বা তাহার ভাগ্যে খাদ্য জুটিবে, বয়স হইয়াছে কবে মরিয়া যাইবে ইত্যাদি। তাহার চাওয়া জিনিষ সে পাইল খাইল, সঙ্গে নিয়া গেল কিন্তু সুখী ঠিক হইতে পারিল না। অনেক সময়ই আমাদের এমন অবস্থা হয় যখন কোনো কাজ করিয়া বেশ সুখী বোধ করিতেছি কিন্তু অন্য কেহ আসিয়া সে কাজ সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিল বা নিন্দা করিল, আমার মনের সুখও মুছিয়া গেল। এক ব্রাহ্মণ যুবক কলিকাতায় কলেজে লেখাপড়া করিয়া ক্রমে আধুনিক হইয়া উঠে। বন্ধুদের সঙ্গে একদিন রেস্তোরাঁয় অতি উৎসাহে, লোভে ও প্রবল ইচ্ছার বশে নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া মনে প্রবল অসন্তোষ নিয়া বাড়ী ফেরেন। খাদ্যের প্রতি তাহার আসক্তি ও আহার্য্যের স্বাদ সবই ছিল তবুও সুখ হইল না। তাহার পারিবারিক নীতি বোধ এবং সামাজিক বিধি নিষেধের চাপ তাহার ইচ্ছা পুরণের সুখটুকুকেও লোপ করিয়া দিল। মানুষের সুখের উপকরণ চারিদিকে ছড়ানো আছে, মনের সাধ ইচ্ছাও কিছু কম নাই তবুও মানুষ সুখী হইতে পারে না। এমন কি যাহা মানুষ চায় তাহা পাইলেও মানুষ সুখী হইতে পারে না এমন বহু ক্ষেত্রেই হয়। মন কেবল ইচ্ছা পুরণই করিতে চায় তাহাই নহে এমন অনেক ইচ্ছা আমাদের আছে যেগুলি আমরা সমাজ, রীতি, নীতি, বর্ণ, দেশাচার, সভ্যতা বা

আইনের খাতিরে পূরণ করিতে পারি না। এমন কি ইচ্ছার প্রাবল্যে কখনো সে সব ইচ্ছা পূরণ করিয়া ফেলিলেও প্রকৃত সুখী হইতে পারি না। এরূপ অবস্থা বা ঘটনা দৈনন্দিন জীবনে এতই স্বপ্রচুর যে এ সম্বন্ধে উদাহরণ দেওয়া বা বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের অধিশাস্তা (Super Ego) এবং স্বাদর্শ (Ego Ileal) নিজের মনের ভিতর হইতেই আমাদের ইচ্ছার সহজ পূরণের পথে বাধা দেয়। কেবল তাহাই নহে, যদি বা ইচ্ছার বশে সব বাধা আগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছা পূরণ করি, তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সুখী হইতে পারি না। মনের এই আত্মদ্বন্দ্বের কথা 'মন' সম্বন্ধে চিত্ত পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধে আরও বিসদ্‌ভাবে বলিয়াছি। এখানে তাই আর পুনরুক্তি করিব না।

এতক্ষণ সুখী হওয়ার পথে সজ্ঞান মনেই যে সকল বাধা ও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের অপর এক অসুবিধার কথা বলিব। 'মন' সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে আমাদের নির্জ্ঞান মন সজ্ঞান মনকে কি ভাবে কতখানি চালনা করে এবং আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের কতরকমের জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে তাহারও কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সময় দেখা যায় যাহা পাইবার ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠে, তাহা পাইলেও মনে সুখবোধ জাগে না। সে পাওয়া যেন ঠিক পাওয়া হইল না। যেন আর কিছু চাই এমনই বোধ হইতে থাকে। যাহা পাইবার ইচ্ছা তাহা পাইলে তবে আমার সুখ হইল না কেন? আপাতঃ বিচারে অর্থহীন মনে হইলেও ইহা সত্য যে আমি যাহা চাই মনে করি আমার প্রকৃত চাওয়া তাহা নহে। আমার আন্তরিক প্রকৃত যে ইচ্ছা তাহা নানা কারণে নিজরূপে প্রকাশ যে আমি ইচ্ছা করিয়াই করি না তাহা নহে, অনেক সময় ইচ্ছা নির্জ্ঞানে থাকিয়া প্রহরীর (censor) তারনায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। ফলে আমার প্রকৃত ইচ্ছা আমি বুঝিতেই পারি না। চাওয়া পাওয়ার এই গরমিল জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না" যে কত সত্য তাহা একটু লক্ষ করিলে নিজের জীবনেই মানুষ বুঝিতে পারিবে।

আমরা কি তবে সুখ পাইব না? পাইব; যে পরিমানে আমার ইচ্ছা নানা বাধা নিষেধের বেড়াজাল ও নানা মানদণ্ডের যাচাই পার হইয়া পূরণের সার্থকতা লাভ করিতে পারিবে সেই পরিমাণে আমি সুখী হইতে পারিব। নির্জ্ঞান মনের কামনা বাসনার সহজ রূপের সঙ্গে পরিচয় থাকা সুখের পক্ষে যেমন অবশ্য প্রয়োজন তেমনই কোন বাসনা বাস্তবে সফল হইতে পারিবে তাহাও জানা দরকার। অসম্ভবের পিছনে ছুটিয়া ক্লান্তি ও ব্যর্থতাই বাড়ে সফলতা লাভ হয় না। অবশ্য ফল লাভের কথা বাদ দিয়াও কেবল মাত্র কর্মের মধ্যে নিজেকে ছাড়িতে পারিলেও, অর্থাৎ মনের বাঁধন সেখানে না থাকিলে, সুখ লাভ হয়।

সুখের পক্ষে নিজের মনের বাধা দূর করা যেমন দরকার বাহিরের বাস্তবের বাধাও দূর করা বা বিচার করিয়া বাস্তবের স্বরূপ মানিয়া নেওয়াও তেমনই দরকার। বস্তু জগৎকে উপেক্ষা করিয়া চলা যায় না। মনে রাখিতে হইবে আমরা যে কল্পনা করি তাহার মূলও আমাদের বাস্তবের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা লাভ করি। সে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না। যেমন আমরা যে লাল রং বলি সেই লাল রংয়ের সঙ্গে আমার আদৌ কোনো পরিচয় কখন না হইয়া থাকিলে আমার পক্ষে লাল রং কল্পনা করা সম্ভব হইত না। বিষয় সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা থাকিলেও তাহার মাত্রা কমাইয়া বা

বাড়াইয়া অনেক পরিমানে কল্পনা করা সম্ভব। বর্ণ সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম আমাদের প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধেই সে কথা সত্য।

বস্তুজগতের সহিত আমাদের পরিচয় জন্মের ক্ষণ হইতেই ক্রমে হইতে থাকে। জন্মপুর্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ভ্রাণ ধ্বনি, স্পর্শ, তাপ ইত্যাদি কি কি বাস্তব অভিজ্ঞতা কতখানি পায় তাহা সঠিক পরিমাপ করা আজও সম্ভব হয় নাই। জন্মের পর হইতে শিশুর বাস্তব জ্ঞান ক্রমে বাড়িতে থাকে। শিশুর দৈহিক ক্রমপুষ্টি ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রমোন্নতির ফলে তাহার বাস্তব জ্ঞানের পরিধিও বাড়ে। এই জ্ঞান যদি ভ্রমাত্মক হয় তবে জীবনের সমস্যা জটিলতর হয়; ব্যর্থতার পরিমাণ জীবনে বাড়িতে পারে, এবং দুঃখ বোধও ততই বেশী হয়। বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবন চলিতে পারে না। সম্মুখে সমুদ্র থাকিলেও আমি হাঁটিয়া পার হইতে পারিব না। হাত বাড়াইয়া চাঁদের এক টুকরা আনিয়া আমার ঘরে আলোকিত করিতে পারি না। এখনই ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তে আমি সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদের পারে বসিয়া বা নরওয়ের ফিয়র্ডের ধারে বসিয়া সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারি না। মানুষ নিজ ইচ্ছা পুরণের জন্য, দুঃখ অসুবিধা দূর করিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছে, বহু অভাব দূর করিয়াছে। অনেক বাধা অতিক্রম করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এদিকে আরও কত যে সফলতা লাভ করিবে তাহা নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যাইবে না। তবু একথা সত্য যে বাস্তবকে স্বীকার করিয়াই মানুষ বাস্তবের বাধা অতিক্রম করিতে পারিতেছে। বাস্তবের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই নিজের ইচ্ছা পুরণের জন্য বাস্তব পন্থায় উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। যে মানুষ এই বাস্তজগতকে বুঝিতে পারে না তাহার জ্ঞান বুদ্ধিও উন্নত হয় না। উনমানস (mental deficient) ব্যক্তি বাস্তজগত সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জড়ধী (Idiot) হইলে তাহার বাস্তব জ্ঞান এতই কম হয় যে তাহারা দৈনিক জীবন যাত্রার যোগ্যতাও অর্জন করিতে পারে না। জল, আগুণ ইত্যাদি সাধারণ বিপদ হইতেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সুতরাং এই দুনিয়ার তাহারা ইচ্ছা হইলেই এমন সব কাজ করিতে পারে যাহার ফলে তাহার নানা রকমের বিপদ এমন কি জীবন নাশও ঘটিতে পারে। এই অবস্থা সুখের অনুকূল নহে।

আমরা নিজের ইচ্ছার বশে বাস্তবকে অন্যরূপে দেখিতে পারি। ভ্রান্তি (Delusion), অমূলক প্রত্যক্ষ (Hallucination) ইত্যাদি মানসিক রোগ লক্ষণ বাদ দিলেও সাধারণ মানুষের জীবনে অনেক পরিমানে এই দুই শ্রেণীর দোষ কম বেশী থাকে। দর্শন শাস্ত্রের তর্কে না ডুবিয়া কেবল প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা বাস্তবকে মনের ইচ্ছার রংয়ে রাঙ্গাইয়া দেখার বহু উদাহরণ পাইতে পারি। অভিজ্ঞতার অভাবে বাস্তবকে ভুল বুঝা বাদ দিলেও যাহাকে আমার ভাল লাগে না তাহার প্রকৃত গুণ অস্বীকার করি বা সামান্য মনে করি এবং তাহার দোষ বড় করিয়া দেখি। যে অন্যায় বা ক্ষতি সে করে নাই সেই দোষও তাহার ঘাড়েই চাপাই। "যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর"—এরূপ ভুল বোঝার যেন শেষ নাই। এই ভুল বুঝা হইতেও আমাদের দুঃখ আসে। শরীরের ব্যাধি, ইত্যাদি, মানসিক আঘাত, বেদনা প্রভৃতি হইতে আমাদের যে দুঃখ তাহা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব না হইলেও বহু পরিমানে লাঘব করা সম্ভব। যে জিনিষের যাহা স্বভাব, যাহা অবশ্যম্ভাবী মন তাহা স্বীকার করিতে পারিলে অর্থাৎ বাস্তবকে মানিতে পারিলে আমাদের বহু ইচ্ছা পুরণ না হইলেও দুঃখের আঘাত তীব্র হয় না। বরং বাস্তবকে স্বীকার করিয়া এবং নিজের ইচ্ছার স্বরূপ বুঝিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান

সম্ভব কিনা তাহা পরীক্ষা করা সহজ হয় এবং যে ক্ষেত্রে তাহা ঘটিতে পারে না, অর্থাৎ যাহা অসম্ভব বিবেচিত হইবে সে ইচ্ছা আমরা ত্যাগ করিতে পারি বা সম্ভব ক্ষেত্রে তাহার আংশিক বা বিকল্পে পুরণ হইলেও সুখ ভোগ করি। অবদমনের (repression) ফলে ইচ্ছার বিকার না ঘটিলে কিম্বা কোনো ইচ্ছার বিশেষ কারণে সংবন্ধন (fixation) না ঘটিলে মনের গূঢ়ৈষা (complex) দূর হইলে জীবনে দুঃখের পরিমান অনেক কমিয়া সুখের পরিমান বাড়িয়া যায়। অবশ্য বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা সুখ লাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুখের জন্য যেমন নিজের মনের ইচ্ছার স্বরূপ জানা প্রয়োজন, বাস্তব সম্বন্ধেও প্রকৃত জ্ঞান থাকা তেমনই প্রয়োজন। মনের অবদমণ, সংবন্ধন, গূঢ়ৈষা ইত্যাদি দূর না হইলে সে মন বাস্তবকে ঠিকমত চিনিতে জানিতে পারে না। মন দিয়াই আমরা চিনি, জানি, বুঝি, বিচার করি। সেই মন যদি কোনো পাকে জড়াইয়া থাকে বা উল্লিখিত কোন অবস্থায় আবদ্ধ থাকে তবে নিজ ইচ্ছা ও স্বভাবকে জানাও যেমন সম্ভব হয় না, বাস্তব সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানও লাভ করা সম্ভব হয় না। নিজের মনের পাক খোলাই সুখ লাভের প্রধান ও প্রথম সোপান।

ইচ্ছা পুর্ণ হইলে সুখ হয় একথা বলিয়াছিলাম। এই ইচ্ছার সম্বন্ধে একটা কথা বলিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ শেষ করিব। সাধারণতঃ আমরা যখন কোনো ইচ্ছা উল্লেখ করি আমরা ঐ ইচ্ছাকে একক বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদের মনে যেমন অগনিত ইচ্ছা আছে এবং পরস্পর বিরোধী ইচ্ছাও আছে তেমনই অনেক সময়ই কোনো ইচ্ছা একা একটি মাত্র ইচ্ছা রূপে প্রকাশ পায় না। একাধিক ইচ্ছার সমষ্টি হিসাবে একটি ইচ্ছা প্রবলরূপে দেখা দেয়। এইরূপ প্রবল ইচ্ছার প্রকৃতরূপ এবং বিভিন্ন অংশগুলিকে ঠিকমত জানিতে বুঝিতে পারিলে বাস্তবের সঙ্গে ইচ্ছার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। কোনো বিশেষ ইচ্ছা পুরণ না হইলেও সেজন্য ব্যর্থতা বোধ বা দুঃখ প্রবল হয় না। আগে হইতেই ফল লাভের আশা বেশী করিয়া দেখার ফলেও দুঃখ বাড়ে। নিজের ইচ্ছা ও বাস্তব এই দুই শক্তিকে যথাযথ স্বীকার করিয়া চলা যাহার পক্ষে যতখানি সম্ভব তাহার পক্ষে সুখ লাভ করাও ততখানি সম্ভব হয়। নিজের মন ও বাস্তজগত সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এই উভয়ের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের অভাব ঘটায় এবং ইহা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি। এই উভয় শক্তির জ্ঞানার্জিত সামঞ্জস্য হইতেই সুখ লাভ হয়। শাস্ত্রে আছে জ্ঞানই দুঃখ হইতে মুক্তি দেয়।

ব্রহ্মজ্ঞানের কথা জানিনা কিন্তু যে মন ও বাস্তব সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহাদের বিষয় জ্ঞান লাভ করিলে বহু দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ মানুষকে এই দুঃখ হইতে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে। এই মনঃসমীক্ষণ বহু মানুষের দুঃখ দূর করিয়াছে, জীবনে সুখের ও আনন্দের হাসি ফুটাইয়াছে। বহু মানসিক রোগী ও এই বিদ্যা শিক্ষার্থী সাধারণ মানুষের মনঃসমীক্ষণ করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

রাসেলীয় বিশ্লেষণ

অলক মজুমদার

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 'Law of cause' এবং 'Law of effect' এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, এ ধারণার বিবর্তন হয়েছে, এবং আজকের পৃথিবীর একজন খ্যাতনামা মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল এ সম্বর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য আমাদের পরিবেশন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষেপে এই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।*

* * * *

কার্য-কারণের সনাতন ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, এবং এর বদলে 'Laws of change' আখ্যা দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। যদি বলা যায়,—'কোন একটি বস্তু 'ক' অপর একটি বস্তু 'খ'-এর কারণ স্বরূপ', তবে ধরা যেতে পারে :

(১) যখনই 'ক' ঘটছে ; তারপর 'খ' আসছে,

(২) এবং এই সম্পূর্ণ পর্য্যায়ক্রম বা Sequence এর মধ্যে 'খ'-এর পূর্বে 'ক'-এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃতিক জগতে কার্য ও কারণের এই সনাতন সম্বন্ধের কোন নিদর্শনই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রকৃতির সমস্ত কিছুই আপাতঃ দৃষ্টিতে একটা চিরন্তন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অবর্তিত হচ্ছে ; এবং এর ফলে যাকে আমরা একটি ঘটনা বলে আখ্যা দিয়েছি, তা' একটি পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। 'Theory of quanta'-ও ব্যহৃতঃ এই মতবাদকে সমর্থন করে। যদি একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে সময়ের মাপকাঠিতে তারা ঠিক পর পর আসছে (contiguous)। যদি এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোন সময়ের ব্যবধান থাকে, তাহলে অন্য কোন ঘটনা ঐ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে নির্দিষ্ট ফলকে পরিবর্তিত করে দিত। ধরা যাক্, কোন ব্যক্তি আর্সেনিক বিষ গ্রহণের ফলে মারা গেছে। কিন্তু আর্সেনিক গ্রহণই এই লোকটির মৃত্যুর চরম কারণ নয় ; কারণ, আর্সেনিক গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোকটিকে গুলী করে মারা হয়ে থাকতে পারে, এবং সেই ক্ষেত্রে লোকটির মৃত্যুর কারণ আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নয়। আর্সেনিক গ্রহণের পর শরীরের অভ্যন্তরের কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে, যার আয়ুষ্কাল পরিমিত, এবং যা শেষ পর্যন্ত পরিনতি লাভ করে মৃত্যুতে। সুতরাং, কারণ নামক শব্দটি আমাদের ধারণার যতটুকু জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে, তাকে আমরা ধীরে ধীরে সীমিত করে ফেলতে বাধ্য হচ্ছি। এবং এইভাবে 'ফল' বা Effect-এর সংজ্ঞাকেও আমাদের সংকীর্ণ করতে হচ্ছে। এমনও হতে পারে, লোকটির মৃত্যুর ঠিক পরমুহূর্তেই তার সমস্ত দেহ একটি বোমার সাহায্যে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ফেলা হোল, অতএব, এ ক্ষেত্রে ফল সম্পর্কে ধারনার কিছু পরিবর্তন করতে আমরা বাধ্য হব। এইরকমভাবে চিন্তা করলে কার্য কারণ সম্বন্ধীয় নিয়মধারায় আমরা প্রতিমুহূর্তে পাই পরিবর্তনের নিশানা।

* বার্ট্রাণ্ড রাসেল রচিত 'Analysis of Mind' গ্রন্থ থেকে ভাবানুবাদ।

আর ঠিক এইজন্যই কারণ সম্পর্কীয় নিয়মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এসে পড়ছি Differential Equation-এর আওতায়। যদিও Differential equation-এ আবৃত কোন নিয়মই সঠিক এবং অখণ্ড নয়। আর তাই আজ বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে সাধারণ শ্রেণীভুক্তি বা generalisation-এর কথা শোনা যায়। Empirical generalisation-কে সত্য বলে ধরলে 'ক'-এর পর 'খ' ঘটবেই না বলে 'ক' এর পর সাধারণতঃ 'খ' ঘটে থাকে বলা উচিত।

কারণ সম্পর্কে মতবাদের সার্বজনীনতা এবং প্রয়োজনীয়তার অভাব ছাড়াও আরও একটি বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তা হচ্ছে, এই ধারণায় অদ্বিতীয়তা বোধ বা feeling of Uniqueness খুঁজে পাওয়া যায় না। 'কারণকে' প্রকৃতপক্ষে যে অর্থে ব্যবহার করা যায় তা হল 'প্রায় অপরিবর্তনশীল পূর্ববর্তী ঘটনা'। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা এমন কোন পূর্ববর্তী ঘটনার কথা জানিনা যা সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল ; এবং সেইরকম কিছু কল্পনা করতে গেলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হিসাবের মধ্যে আনতে হয়।

সনাতন পদার্থবিদ্যা বস্তুর গতিশীলতার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আপাতঃস্পষ্টতা দেখালেও, তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রকৃতির কথা কিছুটা এড়িয়ে গেছে। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর ক'রে বলা যায় কোনো একটি বস্তু কতকগুলি বর্তমান বস্তুর সমষ্টি দিয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা বা system। যখন কয়েকজন ব্যক্তি একটি বিশেষ 'চেয়ারকে' দেখছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই কিছুটা ভিন্ন জিনিষ পরিদর্শন করছেন। সুতরাং যে চেয়ারকে তাঁরা দেখছেন বলে মনে হয়, তা' নিশ্চয়ই একটি প্রকল্প বা নির্মাণ। এখন আমাদের মনে হওয়া নিশ্চয়ই স্বাভাবিক যে 'প্রকৃত চেয়ারটিই' পৃথকভাবে প্রতিটি লোকের কাছে আবির্ভাবের কারণ, কিন্তু 'কারণ' সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করেছি, তা থেকে কোন সাধারণ কারণের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। 'প্রকৃত চেয়ার' বা কোন একটি অজানা কারণের কথা না ভেবে যাঁরা চেয়ারটিকে দেখছেন তাঁদের বিভিন্ন সংবেদন (sensation) এবং আরও কতকগুলি বিশেষ বিষয়ের সমন্বয়কে আমরা 'চেয়ার' বলে আখ্যা দিতে পারি। যখন বিভিন্ন লোক একই চেয়ারকে দেখছেন বলে অনুমান করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তখন তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য একই জিনিষগুলি দেখছেন না। যদিও, বস্তুগুলি যথেষ্টরূপে একই রকমের, এবং যার জন্য তাঁরা প্রায় কাছাকাছি শব্দ দিয়ে তাঁদের পরিদর্শনকে ব্যাখ্যা করতে পারছেন। এই প্রায় সদৃশ ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি পরিপ্রেক্ষিতের নিয়ম অনুযায়ী এবং আলোক রেখার প্রতিফলন (Reflection) এবং ব্যবর্তন (Diffraction)-এর নিয়ম মতেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির সমন্বয়েই চেয়ারটির সৃষ্টি।

পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ; পদার্থবিদ্যা বা Physicis সাধারণতঃ এমন সব পদ্ধতিগুলি নিয়ে আলোচনা করে, যাদের অর্থ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে কোন বস্তুকে একটি সম্পূর্ণ পদার্থ বলেই ধরে নেওয়া হয় ; যদিও এই রকম ধারণা করা হয়, যে সমস্ত স্বতন্ত্র অংশগুলি দিয়ে ঐ পদার্থটি গঠিত তারা পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট বা Correlated এবং এই অংশগুলি পরিবর্তিত হয়েও নিজেদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র স্থাপিত করে। আবার, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে, সেখানে পদার্থের বিশেষ ক্ষুদ্র অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার ; এবং শুধুমাত্র পদার্থের ভিত্তিতেই কি ঘটছে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মনোবিদ্যা সাধারণভাবে এই শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করে থাকে।

স্বতরাং বলা যায় যে, মনোবিদ্যা কোন বস্তুর স্বতন্ত্র অংশগুলির একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গেই জড়িত নয়; প্রতিটি অংশের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আর পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক কতকগুলি বিশেষ অংশের সঙ্গে যারা একযোগে কোন একটি বিশেষ পদার্থের সৃষ্টি করছে; এবং পদার্থবিদ্যা ঐ স্বতন্ত্র অংশগুলিকে একটি সম্পূর্ণ কার্য-কারণ সম্বন্ধীয় একক বা single causal unit বলে স্বীকার করে নিয়ে থাকে। পরে এই প্রসঙ্গে মনোবিদ্যা ও সেই সম্পর্কে মনের বিশ্লেষণে রাসেলের মতবাদ আরও বিশদভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

———

চরিত্র বিচিত্রা

উদয় চাঁদ পাঠক

হাটে বাজারে—(১)

নিজেকেই সেই বাজার ক'রে খেতে হয়। ভাগ্য লিপি বোধ হয় একেই বলে। ছাত্র জীবন কেটেছে মেসে হষ্টেলে। তখন বাজার করার ঝামেলা ছিল না। সখ ক'রে দু'একটা ফল বা মিষ্টি কিনতে গেছি, তা ঐ পর্যন্তই। কিন্তু বিয়ের পর, কবে থেকে ঠিক এখন মনেও পড়ে না, আস্তে আস্তে স্ত্রীর বাঁধন আমায় জড়িয়েছে। তাঁর আদেশ মেনেই আজকাল রোজ ঘুম ভাঙার পর কোনো মতে হাত মুখ ধুয়ে একটু চা গিলে থলি হাতে বাজারে ছুটতে হয়। কারণ আমার যা স্বাস্থ্য তাতে ঐ চাকর ঠাকুরের হাতের রান্নাও যেমন পোষাবে না, আর তেমনি ওদের দিয়ে বাজার করালে যত রাজ্যের সস্তা পচা বাসি শুকনো জিনিষ এনে ডবল দাম লিখিয়ে দেবে। ওতে ওদের শরীর দিন দিন ফুলে ষাঁড়ের মত চেহারা হতে পারবে কিন্তু তাই বলে আমার শরীর আর কদিন টিকবে। এই ত শরীর ইত্যাদি অকাট্য কারণ গৃহিণীর কাছে শুনে শুনে এখন শান্ত কথা-মানা-ছেলের মত আর কিছু না বলে এই রোজকার কাজটুকু আমিই সেরে আসি। প্রতিবাদে ফল হয় না। শুনি আমি নাকি ওদের চেয়েও, মানে ঐ মাইনে করা চাকর ঠাকুরদের চেয়েও, বেশী অবুঝ। আমাকে নাকি বার বার বুঝিয়ে বলেও কাজ হয় না। স্বীকার করব, যত কথাই তিনি বলুন তার মধ্যে ঝাল থাকে না, কেমন যেন একটা হৃদয়ের বেঁধে ফেলা হুকুম থাকে। তবে কাজও হয় ভালও লাগে। এখন ত প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। বাজারের সব দোকানদারই হাজার বার দেখে দেখে চিনে ফেলেছে। যেমন চেনে আরও বহু জনকে। এ এক নতুন রকমের চেনা জানা। নাম জানতে হয় না, দেশ জানতে হয় না, পরিচয় জানতে হয় না তবু চেনা জানা হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠতাও হয়ে যায় কারো কারো সঙ্গে। ঐটুকু চেনা ঐটুকু আপনবোধ করতে ভাল লাগে। দুদিন বাইরে গেলে বা কোনো কাজে আটক পড়ে বাজার যেতে না পারলে পরের দিন দেখা হতেই বলে "কালকে ত আসেন নি বাবু, শরীর ভাল আছে ত?" কখন বা বলে "বাড়ীতে অসুখ বিসুখ নেই ত, যা সময় পড়েছে! খোকা খুকি ভাল আছে?" পরম আত্মীয়ের সুরে নিজের কাজ করতে করতেই প্রশ্নগুলো করে যায়। আমার দিকে চেয়েও হয়ত কথাগুলো বলে না। তবু ভাল লাগে। এক একজনকে নাম জিজ্ঞেস করি। তারপর থেকে সেই নাম ধরেই কথা বলি। সে আপত্তি করে না। এই আমাদের পরিচয়।

সব দোকানী যেমন একরকম নয় সব ক্রেতাও সম-মেজাজের নয়। প্রায়ই দেখি ভারিক্কি চেহারা, হাকিমী চলনের এক ভদ্রলোককে। শীত একটু বাড়তেই ভারি ওভার কোট, মাফলার জড়িয়ে হাতে ছড়ি নিয়ে বাজারে আসেন। সঙ্গে বাজারের থলি হাতে চাকর। ভদ্রলোক প্রায় সব দোকানের জিনিষের দিকেই তাকাতে তাকাতে যান, অনেকটা যেন তাচ্ছিল্যভরে। হয়ত তা ঠিক নয়, আমারই মনের ভুল। তবু আমি যা দেখেছি তাইত বলছি। ভুল হলে তিনি যেন রাগ না করেন। এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ছড়িটা দিয়ে বিশেষ কোনো তরকারী দেখিয়ে দাম জিজ্ঞেস করেন।

দোকানী যে দাম বলে তাতেই আপত্তি ক'রে বলেন "অত দাম পাবে না, যা ন্যায্য তাই পাবে--দিয়ে দাও" তারপর একটা পরিমাণও উল্লেখ করেন। কোনো কোনো দোকানী বলে 'আজ্ঞে, আপনাকে কি আর বেশী বলবো! ঠিক দামই বলেছি, জিনিষটা কেমন দেখছেন ত? বাজারে এমন পাবেন না।" ভদ্রলোক বলেন "হুঁ, আর বকতে হবে না দাও।" দাম দেবার সময় কিছু কম দিয়ে চলতে সুরু করেন। দোকানীকে বলতে শুনি "না বাবু, লোকসান হয়ে যাচ্ছে পারবো না, আর চারটে পয়সা দিন" কে কার কথা শোনে? একদিন এই রকমের ঘটনার পরে এক দোকানীকে বলতে শুনেছি, "ভারি ভারি জামা চড়ালেই বড়লোক হয় না। দু'পয়সা দেবার মুরোদ নেই বড়লোকি ফলাতে আসেন।" আমাকে সামনে দেখে বলে—"দেখলেন ত বাবু! রোজ আসবে বাজারে, জিনিষ নেবে নিজের ইচ্ছামত, দামও দেবে নিজের খুসীমত, আমরা যেন হুকুমের চাকর; কথাই শুনতে চায় না। আচ্ছা দেখা যাবে!" বলেছিলাম তোমার না পোষালে তুমি জিনিষ দাও কেন, আর দিলেই যখন, জেনে শুনেই, তবে আর রাগ কর কেন। তার উত্তরে শুনেছিলাম ভদ্রলোক ভারি হুকুমদারী লোক। এসেই হুকুম চালান না দিলে তেড়া তেড়া কথা শোনান। এমন তাচ্ছিল্য ক'রে সে সব কথা বলেন যেন দুনিয়ায় আর কেউ মানুষ নেই তিনি ছাড়া। ভাবছিলাম। জিনিষ তোমার তুমি দাম না পেলে দিও না, কথা উনি শোনান গ্রাহ্য কোরো না, তাতে অন্ততঃ মনের শান্তি আর টাকার লোকসান বাঁচবে, কথাটা বলা হয়ত সহজ কিন্তু সেভাবে কাজ করা কি সহজ! দোকানীর তখনও মনের জ্বালা মেটেনি, বলে "ঐ জামাকাপড়েই ভদ্রলোক,। লেখাপড়া শিখে সাহেব হয়েছেন; মনটা দেখলেন ত?"

বিরক্তির উক্তিতে কত সহজভাবে অতি সত্য কথা মানুষ প্রকাশ করে। লেখাপড়া শিখে জামা, সাড়ির বাহার দেখিয়ে আমরা ভদ্র আর ঐ দোকানীটা ত ছোটলোক! তার আবার দুঃখকষ্ট কি? জিনিষ কিনেছি তাই তাকে উদ্ধার করেছি, পায়সা দিয়েছি, ঐ যথেষ্ট।

শীতের বাজারে ফুলকপি মোটামুটি রকমের আমদানী হয়েছে। ভাল মন্দ জাত বুঝে, বড় ছোট আকার অনুসারে দাম। যে দোকানে সাধারণত আমি কপি কিনি তার পাশের দোকানে বেশ ভিড় জমেছে, চেঁচামেচি গোলমাল দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। এগিয়ে গেলাম কপি কিনব বলে। ক্রেতার সঙ্গে দোকানীর ঝগড়া বেধেছে। অন্যলোকে পক্ষ নিয়ে ভিড় জমিয়েছে, কেউ এদলে কেউ ওদলে। অনেকে আছেন নীরব শ্রোতা। কি থেকে কি হল জানি না, শুনছি দোকানি সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে হাত ছুঁড়ে চিৎকার ক'রে বলছে—"কি, কী বলতে চান কি আপনি? ঢের দেখেছি আপনার মত বড়লোক। দাম না দিতে পারেন হাত দেবেন না আমার জিনিষে, ঐ মাটিতে পড়ে আছে তাই নিয়ে বাড়ি যান।" অপর পক্ষ আরও গর্জন ক'রে বলছেন "কী বল্লে, কী বল্লে ছোটলোক কোথাকার! যা মুখে আসবে তাই বলবে। ছোটলোক বাঁদর—কান ছিঁড়ে ফেলবো বদমাস্ ছোটলোক"—অপর পক্ষের হুঙ্কার আরও প্রবল হল "কী বল্লেন, আসুন ত দেখি কে কার কান ছেঁড়ে, মুখ সামলে কথা বলবেন, না হলে মুখ ভেঙ্গে দেবে" বলতে বলতে সে দোকান ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, 'ঠিক যুদ্ধং দেহি' ভাব নয়, হিংস্র কোনো পশুর মত যেন ফুলে ফেঁপে এখনই ঘাড়ে, ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনি ভাব। দুই তরফের একই ভাব। শিক্ষা ভদ্রতা, লোক লজ্জা, সংযম এসবের কোন মূল্যই সেখানে নেই। জিনিষ কেনা বেচা, রোজগার করা, আপিস যাওয়া, এ-সব চিন্তা কোথায় তখন তালিয়ে গেছে। ঘটনার সূচনা জানিনে সমাপ্তিও জানিনে। ভাবছিলাম আমার মধ্যেও যে হিংস্র জানোয়ারটা আছে কী জানি কবে সে দাঁত খিঁচিয়ে--নখ বের ক'রে

এভাবে বেরিয়ে আসবে। হাটে বাজারে যা দেখলাম এ ত একা একজন বা দুজন মানুষের কথা নয়! সব মানুষের অন্তরের একটা দিকের এই রূপ। আহত বোধ করলে আমার মনের এই হিংস্র জন্তুটা ঐ ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করবে কি? একটু বোধ হয় আনমনা হয়েছিলাম আমার পরিচিত দোকানী আমায় জাগিয়ে দিয়ে বলল "ও কি শুনছেন বাবু, ক'টা কপি দেবো।" লজ্জিত বোধ করেছিলাম, বললাম "শুনছি না কিছু হরি, ভবাছিলাম আমি ত ঐ রকম করতে পারি!" হরি নিজে বাছাই করে দুটো ফুল-কপি আমার থলিতে ভরে দিতে দিতে বলল "কী যে বলেন বাবু, সবাই কি সব পারে! ও সব মানুষ আলাদা।" জানি না কেন হরি সেদিন আমার কাছে দাম চায়নি। আমিও তাকে একটা টাকা দিয়ে চলে এসেছি। পরের দিন হরি আমাকে চার আনা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলেছিল "বাবু কালকে আপনার মনটা খারাপ ছিল। তাই কিছু বলিনি, আপনি চলে গেলেন, পয়সা ফেরত দেওয়া হয় নি।" একটা পঁচিস নয়া পয়সা সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে এলো। নিতে পারিনি। হরি মানে না। সেদিনের সওদা দিয়ে সঙ্গে কিছু কড়াইশুটিও দিয়ে বললে "দিদিমনি খাবে।" একটু ইতিহাস আছে। পাঁচ বছরের মেয়ে একদিন বিকেলে আমার সঙ্গে বেড়াতে এসে বাজারে কমলা কিনে হাতে নিয়ে চলেছিল। হরির দোকানের সামনে দিয়ে আসছি, কিছু কেনবার ছিল না। তার দিকে তাকিয়ে একটু পরিচিতের হাসি হেসেছি। সে বললে "আপনার মেয়ে বুঝি?" দাঁড়ালাম, বললাম "হাঁ সঙ্গে এসেছে বেড়াবে বলে।" "এসো দিদিমনি, কি খাবে" বলতে বলতে কয়েকটি কড়াইশুটি সে তুলতুলের হাতে দিলে। কোনো দ্বিধা না ক'রে সেখানে দাঁড়িয়েই সে কড়াইশুটি খেতে আরম্ভ করলে। হাতের ক'টা শেষ ক'রে আবার হাত বাড়ালে আরও চাই। হরি হেসে তার হাতে আবার ৩।৪টে দিলে। বলেছিলাম—"দেখলে মেয়ের কাণ্ড! তোমার সব খেয়ে নেবে।" আপত্তি জানিয়ে হরি বলেছিল "ও কথা বলবেন না বাবু, মা লক্ষ্মী হাত পেতে আমার কাছে চাইছেন না দিলে যে অকল্যান হবে। মা লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সব হবে। নেও মা এই," আবার হাত ভরে দিলে। তুলতুল ভারি খুশি। কড়াইশুটির দানা মুখে পুরছে, একবার ক'রে হরির দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে হাসি মুখে তাকাচ্ছে। ফিরে আসবার আগে হরি বললে "আবার এসো মা লক্ষ্মী।" তারই উদ্দেশে সেদিনও সে থলিতে বেশ খানিক কড়াইশুটি ভরে দিয়েছিল। হরি কি সত্যি বিশ্বাস করেছে যে খুকি মা লক্ষ্মী হয়ে তার কাছে হাত পেতে চাইতে এসেছে? শিশুর সহজ ইচ্ছা মেটাতে পারার আনন্দ সে ভোগ করেছিল কি? হয়ত শিশুর প্রতি মমতা হরির মনকে আর্দ্র করেছিল। হরির বুকের আবেগের ঢেউ আমার বুকেও এসে দোলা দিয়েছিল। হরি যেন কেমন অন্য শ্রেণীর লোক হয়ে গেল আমার কাছে। সম্পর্কটার মধ্যে দোকানদার, খরিদদার সম্বন্ধটা আর বিশেষ রইল না। মাঝে মাঝে তুলতুলকে নিয়ে যেতে হয়, হরির পীড়াপিড়িতে।

এক ভদ্রলোক বেগুন কিনছিলেন। এক সের বেগুন কিনবেন। যে কয়টা বেগুন পছন্দ ক'রে দিয়েছেন, ওজনে দেখা গেল এক সেরের বেশী হয়ে যাচ্ছে। বড় বেগুনটার বদলে অপেক্ষাকৃত ছোট বেগুন দিয়ে ওজন ঠিক করতে চেষ্টা করছে, ভদ্রলোক বললেন "ওটা নামিও না। ঐ যা আছে থাক" "ওজন দু'ছটাক বেশী হচ্ছে" "বেগুন বেচতে বসেও যে সোনার ওজন দেখছ। ঐ একটু বেশী তা কি হয়েছে—দাও।" "না বাবু ওর দাম পড়বে দু'আনা।" "তোমার টাকার খাই ত কম না হে—ঐ টুকু ওজন বেশীতে কি এসে যায়। দাও দিয়ে দাও।" "আমাদেরও ওজনেই কিনে আনতে হয়, বেশী দোবো কোথেকে। আমার বাগানের জিনিষ ত নয়।" ভদ্রলোকের বোধ হয় কোথাও আঘাত লাগাল বললেন

"অনেক ত কথা ছাড়ছ দেখছি, ঐ টুকু ওজন ছাড়তে পার না! খুব পয়সা চিনেছ ত! একটা কথা রাখতে পার না!" দোকনদারও ছাড়বার লোক নয়, বলে বসল "আমি ত কথা ছাড়ছি ওজন ছাড়তে পারি না বলছেন কিন্তু বাবু আপনিও কথা অনেক ঝাড়ছেন পকেট ত ঝাড়তে পারছেন না।" উচ্চস্বরের লোকের প্রতি নিম্নস্বরের লোকের এমন উক্তি সহ্য করা অসম্ভব। বেগুনগুলো ওজনমত মিলিয়ে যে ছোট ঝুড়িটাতে রেখে ঝুড়িটা খরিদদারের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল ভদ্রলোক সেটাকে হাতের ধাক্কায় উল্টে দিয়ে "তোমার বেগুন তোমার মত গরুতেই খায়" বলে হন্‌হন্ করে চলতে সুরু করতেই দোকানী বলে উঠলো "হাঁ আপনাদের মত ভদ্রপোষাক পরে এসেই এ বেগুন খায়।" শুনলাম সবই। বলবার কিছু পেলাম না। আর বলবই বা কাকে?

লুম্বিনির—
রচনা ও কলা

চিত্তভ্রংশী-ভ্রমবাতুলতা (Paranoid-Dementia)

কনক মজুমদার, এম, এস্‌সি.*

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধসমূহে এক একটি বিশেষ মানসিক রোগের পৃথক রোগ লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। এবারে একই সঙ্গে বিভিন্ন রোগ লক্ষণের একত্র সমাবেশ দেখানো হয়েছে। প্রথমে এক ধরণের রোগ লক্ষণ নিয়ে রোগের সূত্রপাত হয়, ক্রমশঃ অপর একটী রোগের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। চিত্তভ্রংশী বাতুলতা একটি রোগ, ভ্রমবাতুলতা অপর একটি রোগ। অনেক ক্ষেত্রেই উপরোক্ত উভয় রোগের লক্ষণ গুলি একই রোগীর মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখা যায়। নিম্নে একটি রোগিনীর বিবরণে দেখা যাবে—ঐরূপ একাধিক রোগের একত্র সমাবেশ। রোগিনীর প্রথম অবস্থায় চিত্তভ্রংশী বাতুলতার লক্ষণ দেখা দেয়,—যেমন এলোমেলো কথা, উত্তেজনা, বাস্তবের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থা, বুদ্ধিবৃত্তির অবনতি, ইত্যাদি। ঐরূপ অবস্থার ক্রমশ পরিবর্তন হয়ে ভ্রমবাতুলতার লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন কতকগুলো ভুলধারণা। নিজেকে পুরুষ মনে হওয়া, অপরে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছে মনে হওয়া, এক লোককে অন্য লোক মনে হওয়া ইত্যাদি। সেই সঙ্গে কতকগুলো আবেশিক চিন্তা (obsessive thoughts) ও মনে আসতে থাকে, যেমন —খারাপ কথা মনে আসা, বারবার সেগুলো মনে হওয়া, নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও সেই 'মনে হওয়া' বন্ধ করতে না পারা ইত্যাদি। তার বেশী কষ্ট হত আরও এই জন্যে যে সে ভাবত তার মনের ঐ সব কথা অপর সকলে জানতে পারছে। নিজের সম্বন্ধে তার খুব উচ্চধারণা ছিল। ঐ ভাবে ক্রমাগত খারাপ কথা মনে হওয়াতে নিজের সেই ধারণা আর সে বজায় রাখতে পারছিল না। ফলে সে ক্রমশঃ বিমর্ষ হয়ে পড়ছিল। তাকে সকলে অবজ্ঞা করছে, অনাদর করছে, হেয় প্রতিপন্ন করছে ইত্যাদি মনে হতে লাগল।

রোগিনী পিতামাতার প্রথম জীবিত সন্তান। তার পূর্বে পিতামাতার বহুসন্তান জন্মের পরেই মারা যায়। পিতামাতার পৌঢ় বয়সের প্রথম সন্তান হিসাবে সে অত্যাধিক আদর এবং প্রশ্রয়ের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। অতি আদরে পালিত হওয়ার ফলে তার অহং স্বভাবতই দুর্বল ভাবে গঠিত হয়েছে। শিশুকাল কেটেছে অবাধ গতিতে, নিজের এবং ছোট ভাইয়ের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছে। সকলের কাছে প্রশংসাও পেয়েছে। যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মনে যৌন আবেগ এসেছে তার তখন মনের প্রবৃত্তি সমূহের সম্বন্ধে যথাযত ধারণা এবং শিক্ষা না থাকায় সহজ বৃত্তিগুলোকে খারাপ মনে হয়েছে, নীতি বোধের সঙ্গে সংঘাত লেগেছে। সেগুলোকে চাপা দেবার বা অস্বীকার করবার চেষ্টা হয়েছে। কখনও মনে হত সে পুরুষও নয়। কখনও অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে, কিন্তু সহজ বৃত্তির প্রবল বেগ নিয়ন্ত্রিত করবার মত শক্তি তার অহমের ছিলনা। ফলে সে অসুস্থ হয়েছে।

যৌন ইচ্ছা সুষ্ঠুভাবে অবদমিত হয়ে শিল্পকলার সৃষ্টি করে। রুদ্ধ ইচ্ছায় আবেগের সৃষ্টি হয় এবং সেই আবেগ যদি ভাষার মাধ্যমে সুসামঞ্জস্যভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহলে মনের ভারসাম্য বজায় থাকে।

---

*হিন্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের মনোবিদ্ এবং লুম্বিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালের মহিলা সমাজকর্মী।

এই রোগিনী তার আমদমিত ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে কিছু পরিমাণে সক্ষম হয়েছিল। তার মধ্যে একটি শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে তার ভাবাবেগকে ভাষায় সুন্দর রূপ দিতে পারে।

উপরোক্ত রোগিনীর লেখা ডায়েরীর কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হল। তার মধ্যে রয়েছে তার নিজের কথা, কবিতা, ও অন্যান্য রোগিনীর চরিত্র চিত্রন।

শুক্রবার সকাল

"নতুন পেয়ালায় ভরা চায়ের মত নতুন একটি সকাল। বসে আছি রেবার ঘরে অঞ্জুর বিছানায়। অলস মনের পটে কত ছবি ফুটে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে আবার। সুসংবদ্ধভাবে কিছুতেই মূর্তি এঁকে রাখতে পারছিনা। যা আসে, অলস আমি অলস ঔদাস্যে রোমন্থন করি মনে মনে, বাইরের জগতে তাকে রূপদান করতে পারিনা; বিশেষ ইচ্ছেও নেই। অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা প্রকাশের ব্যাকুলতা একটা মধুর সুর হ'য়ে বাজে। হঠাৎ ভেসে উঠ্‌লো একটি ছবি, অবার মিলিয়ে গেল। বসে আছি এখানে মনটা হঠাৎ চলে গেল কোথায় কোন দূর প্রান্তে, একটি ছোট্ট বাড়ীর উঠানে বেলফুলের গাছগুলির কাছে। মনটা যে কি অদ্ভুত পদার্থ,—কখন কোথায় ভেসে চলেছে ঠিক নেই, "মন উড়ছে উড়ুক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।" আপন দৃষ্টি ভঙ্গি দ্বারা মানুষ সবকিছুকে দেখে, বিশ্লেষণ করে। তাই আমার মনের অনুভূতির প্রকাশ অপরের মনের রঙে রঞ্জিত হয়ে নতুন ছবি হয়ে ওঠে। হয় কিছু বাড়িয়ে নয় কমিয়ে দেখে তারা। আমার মনের কথা যখন অপর মনের দরবারে হাজির হয় তখন তাকে বাধ্য হয়েই একটা নতুন বেশ ধারণ করতে হয়। কতদিন এসেছি এই হসপিটালে। বি. এ পরীক্ষা দিতে গিয়েহঠাৎ History-র দিন পরীক্ষার হলে নাকি লেক্‌চার আরম্ভ করি। দর্শনের অধ্যাপক সমরবাবুর নামে কি যেন বলেছিলাম। বাড়ীতে এসে মনে হত মাষ্টার মশাই 'ঠাকুর', অর্দ্ধেন্দু বাবু (বাংলার অধ্যাপক) দাদু শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় আর দেবী বাবু 'বুদ্ধ'। বাড়ীতে এ্যালবাম নিয়ে বসে থাকতাম, কাঁদতাম "ঠাকুর ছাড়া কাকেও চাইনা আর বলতাম শিবের পুজা তাত জন্মেও কোরবনা।" সেই সময়ে আমার ভাই গোপাল আর নকু খুব করেছে। একদিন নাকি খোকার হাতে কামড়ে দিয়েছিলাম আর বেবীদাকে গ্লাস ছুড়ে মারতে গিয়েলাম। তারপর এই লুম্বিনী পার্কে আগমন। কিভাবে এসেছি আমার কিছু মনে নেই। এইমাত্র একজন নতুন পেসেণ্ট এলেন আমার পাশে এসে বসেছেন ভারী সুন্দর কমনীয় কান্তি। নাম মলিনা সিংহ দুটি ছেলে মেয়ে আছে বাড়ীতে। রাধাশ্যামের পুজারী। কয়েকদিন আগে দুজন নতুন পেসেণ্ট এসেছেন্। একজন গীতা মুখোপাধ্যায় আর একজন সীতাকি। মায়া মাসী চলে গেছেন কদিন হ'ল। উনি যাওয়ায় মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। বহুদিনের পুরানো রুগী ছিলাম উনি আর আমি। ওর বাড়ী মুর্শিদাবাদে। আমাকে অনেক করে যেতে বলে গেছেন। বাড়ীতে রাধাবল্লভ আছে। জাগ্রত দেবতা। অনেক গল্প শুনলাম, বিগ্রহের ত একদিক সাদা একদিক কালো, এক অঙ্গেই যুগল রূপ। গোটা পায়ে চিক্‌চিক্ করছে বালির কনার মত কুচি। একবার সবাই ঠিক কোরল রাধা মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা কোরবেন। তার পরেই বাড়ীতে ঠাকুর খুঁজে পাওয়া গেল না। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। শেষে ঠাকুর স্বপ্ন দিলেন বিয়ে করবে না, রাধা মূর্তি একই অঙ্গে আছে। কুয়োর মধ্যে ঠাকুর লুকিয়ে ছিল পাওয়া গেল। আর একবার ঠাকুরের পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে গিসলো।"

লুম্বিনী পার্ক

শনিবার সকাল

"কাল রাত্রে কিছু খাইনি। ঘুল ভাঙ্গলো বেশ ঝরঝরে শরীর নিয়ে। রেবার ঘরে বসে আড্ডাসহ চা লুচি মন্দ লাগলোনা। মলিনাদি এতক্ষণ বসে ওদের পারিবারিক গল্প কোরছিল। স্বামী স্ত্রী আর একটি ছোট্ট ছেলে এই ওদের সংসার। মলিনাদিও এই ফিমেল ওয়ার্ডে অ্যাপ্রেন্‌টিশ্ রূপে এসেছে মাসখানেক। মাইনে অতি সামন্যই দুজনের। অথচ কি সুখী। চাহিদা যতকম হয় সুখ তত বেশী পাওয়া যায়। প্রথম মাইনে গেয়ে স্বামীকে টাকা দিয়ে ছিল, সাড়ী ব্লাউজ, পেষ্ট, স্নিপার কিনে দিয়েছেন। খুব খুসী। ওর পেনটা আমায় দিয়ে গেল। সেই নতুন পেনেই লিখছি। এইমাত্র কনকদি এলেন জানালা দিয়ে দেখলাম। কখন উপরে আসবার সময় মিলবে কে জানে! এই লুম্বিনী পার্কের হাসি কান্নার ছোঁয়াচ লাগানো দিনগুলি ভবিষ্যতে জলের আঁকা ছবির মত ঝাপসা হয়ে যাবে, প্রতিটি মানুষের উপর কি গভীর মমতা! কনকদি আসার জন্য পথ চেয়ে থাকে মন সব সময়েই। ডাঃ বাবুদের সিষ্টারদের মধুর স্মৃতি চিরতরে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে মনের ফ্রেমে। "বোবার ইঙ্গিত ভাষা পেল" একটা গভীর স্নেহ সকলকে বেষ্টন করে বোঝাতে চায় আমার মনের কথা। আমার মমতার স্পর্শ লাগুক সবার মনে, ফুল হয়ে ফুটে উঠুক যা অব্যাক্ত যা অনিবচনী।"

শুক্রবার সকাল

"গত শনিবারের পর হ'তে খাতা আর বের হয়নি। মন একটা অদ্ভুত করুণ অবসাদের দুর্গে আবদ্ধ। বিচিত্র এই পৃথিবী আর বিচিত্র মানুষের মন। হিংসা নামক পদার্থটি যদি না থাকত পৃথিবীটা কত সুখের হত। দীর্ঘ ন মাস এখানে এসেছি। ইনসুলীন' শক দারুণ যন্ত্রণাতে কোনদিন অশ্লিয় ব্যবহার করেছি বলে মনে পড়ে না। সেই আমাকে সকলের চোখে হেয় করার জন্য কি সক্রিয় প্রচেষ্টা! হাসি পায়, কান্নাও পায় মানুষের এই হিংস্র ব্যবহারে। সকলের কাছ হ'তে অকৃত্রিম স্নেহ অজস্র ধারায় পেয়েছিলাম সেই জন্যই প্রতিদিন আমাকে ছোট করার জন্য এত ছলনা! গতকাল ডাঃ বাবু এসেছেন শুনে নিচে গেলাম। কিন্তু কেন জানিনা উনি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন মনে হল কথা বল্লেন না। অন্তরে দারুন যন্ত্রণা অনুভব করলাম। সন্ধার সময় ডাঃ ঘোষাল ভিজিটে এসে যখন বল্লেন "কি খবর? সিষ্টার কোনদিন খারাপ হতে পারে না।" অভিমানে কান্নার ঢল নামতে চইলো। অনেক কষ্টে চেপে রইলাম উনি যাবার পর সমস্ত বেদনা দুচোখে ধারা ঝরতে লাগলো। উষাদি এসেছিলেন ওর সামনেও নিজেকে চেক্ করতে পারিনি। মানুষ কেন মানুষের মনের কথা জানতে পারে না? একটা মানুষের চলাফেরা দিন দিন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার চরিত্রের ছাপ পাওয়া যায় না কি? হিংসার বিষাক্ত পদার্থ পৃথিবীতে আর কিছু নেই, এ জগতে যারা মনের উপর একটা পালিশের মুখোস পরে চলতে পারে তারাই জয়ী।

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছো ভাল?"

অহিংসা প্রচারের জন্য গান্ধীকেই প্রান দিতে হয় নাথুরাম গড়সেদের হাতে। কতদিন এখানে এসেছি। বাড়ী ঘরের ছবি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখানে সকলের উপর কি গভীর মমতা পড়েগেছে। এখানেই যেন ঘড় বাড়ী হয়ে গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেড চেঞ্জ হয়েছে, আমার বিছানায় অঞ্জু গেছে আমি রেবার ঘরে এসেছি, বহুদিনের পুরানো স্মৃতি জড়ানো ইনস্যুলীনের ঘড় ছেড়ে একটু কষ্ট লাগছিল। বিশেষতঃ রমাদির জন্য ঐ ঘরটার ওপর মায়া।

শুক্রবার

সকাল—১১টা

"এক সপ্তাহ খাতা পেন্সিল বের কোরতে পারিনি। এইমাত্র ডাক্তার বাবু চলে গেলেন। ওঁর পায়ে আমি, রেখা, পুর্ণিমা আবির দিলাম। ওঁর প্রশান্ত স্মিত হাসিটির মধ্যে, করুণার ধারা ঝরে পড়েছে। একদিন ওঁকে না দেখ্‌লে ভাল লাগেনা। উনি বোললেন সামনের সপ্তাহে আমাকে ছেড়ে দেবেন। শুনে বেদনার নীড়ে একটা ঝঙ্কার উঠ্‌লো। বাড়ী ঘর ছেড়ে দীর্ঘ দশমাস এখানে রয়েছি। সকলের কাছ হ'তে যে স্নেহসুধা পেয়েছি, তার টান অন্তরের সঙ্গে গাঁথা গেছে। তাই বাড়ী যাবার কথায় আনন্দের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বেদনা বোধ হৃদয়ের গভীরে বাজ্‌ছে। মা, বোন, বাবা, ভাই, সবার ভালবাসাই এদের মধ্যে পেয়েছি। আজ সকালে রেবা আমার চুলে তেল মাখিয়ে সস্নেহে শাসনে তাড়াতাড়ি স্নান কোর্‌তে পাঠিয়ে দিলো। প্রতিদিন আমাকে ঘুম হতে উঠানো, বিছানা ঝেড়ে দেওয়া, জোর কোরে খাওয়ানো ওর কর্ম পদ্ধতির মধ্যে পড়ে গেছে। এই ভালোবাসার জালে দিনে দিনে জড়িয়ে পড়েছি। এদের সকলের ছবি আগামী ভবিষ্যতের স্মৃতি মাত্র হয়ে থাক্‌বে স্মরণের মণিকোঠায়। গতকাল দোলপুর্ণিমা ছিলো। ভোরবেলা প্রতিমাদি এসে কপালে আবির দিয়ে গেলেন। প্রতিমার মতো মুর্তিখানি। দৃঢ়, ঋজু চেহারা যেন অর্জ্জুনের মত মনে হয়। আমি, রেখা, মঞ্জু, লীলাদি ছায়ামাসী সবাই ফাগ, মহুদি, উষাদির পায়ে দিয়ে মিষ্টারদের কোয়াটার্সে গেলাম। মনে হয়েছিলো আমরা যেন বৃন্দাবনে আছি। সবাই সবায়ের মুখে আবির মাখিয়ে দিলাম। রেবার প্রাণচাঞ্চল্য বেশী, ও না থাকলে সব ঝিমিয়ে পড়ে। কমলাদি, সুবাদি, প্রতিমাদি, মলিনাদি সবাই ছিলেন। অমিয়াদিকে জোর করে নামিয়ে, মাথায় জল, দুধ রং ঢেলে দেওয়া হ'লো। উনি শিবের মত চুপ কোরে বসে রইলেন। অদ্ভুত, সুন্দর লাগছিলো এদের এই হুড়তা। হোলি খেলার পর কমলাদি আমার মাথায়, প্রতিমাদি রেখার মাথায়, মালতিদি অঞ্জুর মাথায় সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে দিলেন, ওঁদের এই অকৃপণ ভালবাসা চিরদিন মনে থাক্‌বে। মহুদি, আর উষাদি সকালে আমাদের মিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর ঘরে এসে office এর বাবুদের হোলি খেলা দেখতে লাগ্‌লাম। উপেনবাবুকে সবাই মিলে নর্দমার পাঁকে ফেলে দিল। সকালে ডাক্তার ঘোষালকে ও ডাক্তার চৌধুরীকে প্রণাম কোর্‌লাম্।"

কোন একদিনে

অনীতাকে—

আকাশের নীলভাশে রাঙা চিঠি কে পাঠাল
আজকে আবার
অশোকের পলাশের সবুজ পাতায় লেখা
ফুলের আখরে
চিঠি নয় যেন কার রোমাঞ্চিত হৃদয়ের পদ্মগন্ধ ঝরে
বনের মর্মরে বাজে কার সে মনের সুর
বসন্ত বাহার।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে নিত্য অভিনয়ে
নব ভূমিকায়
এ জীবন পট মম অভিনয়ে পটু
আত্মার আত্মীয় কোথা খুঁজে ফিরি তায়
ভুলে যাই কেবা আমি কেন এই ব্যথা।
প্রাণের প্রবাহধারা মরুপথ বেয়ে
চলেছে সে কোন এক সাগর সঙ্গমে
ঝড়ের গর্জ্জনে জাগে ক্ষুব্ধ কেন স্রোত
নিষ্ঠুর নিয়তি হাসে নিরুপায় মেয়ে।

দুখের পরশে আজি জীবনের পটে
নিত্য নব ছবি ফোটে নব নবরূপে
সে কোন শিল্পীর তুলি ধ্যানের খেয়ালে
আঁকিছ নবীন ছবি জীবন দেওয়ালে

পুজাহীন দিনগুলি অন্ধ স্রোতে
চলেছে কোথায় বয়ে কেই বা জানে
রুদ্ধ জড়ের বুকে এলো কোথা হ'তে
যে সুর বাজিয়াছিল তোমার গানে
সিন্ধুর তরঙ্গছন্দে সে সৃষ্টির ধারা
হিমাদ্রি যাহার স্তবে আপনাহারা
তারি লাগি পুজা নীতি বেদনা ধ্যানে।

অনীতাকে—

দাড়ি নিয়ে হেসে গেয়ে সুন্দরী মেয়ে (মেয়েটির অল্প দাড়ি ছিল)
সবারে ফেলেছে ফাঁদে কিসের টানে
তারলাগি কত নীল আঁখি পথ চেয়ে
মায়াবী হাসিটি তার কি জাদু জানে,
চঞ্চল অঞ্চলে ছন্দধারা
কবরীতে কমলের মৃদু মধুগন্ধ
জড়ের নর্তন মাঝে সুরের ঝরো
বহিজগত হায় আজও তবু অন্ধ
আমার হাসির মাঝে ধেয়ানের ছবি
পড়েনি কাহার কোন দৃষ্টিপাতে

স্বষ্টির উৎস মাঝে ধ্যানস্তব্ধ কবি
অনির্বান দীপশিখা আঁধিয়ার রাতে।

কি যে চাই কার লাগি আঁখি তারা ঝুরে,
বোঝে না হৃদয় মম, শুধু পথ চাওয়া,
কোথা সে পুজার মন্ত্র এ জীবন পুবে
বেদনার বনে বহে ক্ষ্যাপা ঝড়ো হাওয়া॥
নূপুরের নিক্কনে, বেণুটির স্বরে
এ পরান রাধা চলে নীতি অভিসারে
মরণ যমুনা কুলে ঢেউ জাগে ফিরে
তাই বুঝি এত ব্যথা জাগে বারে বারে॥

শনিবার সন্ধ্যা

"এইমাত্র বেড়িয়ে ফিরলাম। মেলওয়ার্ডের সামনে দিয়ে গিয়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে ঘুরে এলাম। কি ভালই যে লাগে এই বেদিয়াডাঙ্গা রোডে ঘুরে বেড়াতে। এই জায়গাটা শহরতলীর মত। বেদিয়াডাঙ্গা নাম এর সার্থক। চারিদিকে যতদুর দৃষ্টি যায় বড়ো বড়ো বিলের বুকে কচুরীপানার গালচে পাতা সবুজের সমারোহ। মাথার ওপরের উদার আকাশ ঝুঁকে পড়েছে দুর প্রান্তে গাছের মাথায়। চারিপাশে গরু মহিষের খাটাল—অবাধে বিচরণ করছে পথের ওপর। রাস্তাগুলি যাযাবরীদের বিচিত্র বাসের মতই নোংরা। আজ কমলদি, সুধাদি, ইন্দুদি আমাদের নিয়ে গিছলেন বেড়াতে। কমলদি খুব মজা করছিলেন 'face to face' 'leap to leap' বলে। ওপরে ছায়াদি আছেন তাঁর প্রত্যেক কথায় ইংরেজী বলা চাই। বলেন—my hasband ; faithful dog, "আমি বড় weakness"। সেই নিয়ে খুব মজা করা হয়। স্বামীর প্রসঙ্গে বলেন "বাবু আমায় না দেখে খুব কষ্ট পাচ্ছেন।" "রাজা, আমায় ক্ষমা কর" প্রভৃতি। আর একজন আছেন শীলামাসি—গোলগাল মানুষটি এম্নিতে বেশ ভাল তবে রাগ হলে হসপিটালের সবাইকে যা তা বলেন। গৌরীমাসি এইমাত্র ১২ দিনের প্যারোলে বাড়ী গেলেন। সকালে গেছে অঞ্জু ১ দিনের প্যারোলে। গতকাল রাত্রে রেবা গেছে ৭ দিনের প্যারোলে। আমাদের ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেছে।.................. সেদিন রমাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল—উনি বলছিলেন "Spiritualism হচ্ছে Science of all sciences. Material science, facts and figure এর উপর নির্ভর কোরে চলেছে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক পথ অত্যন্ত সুক্ষ্ম। Spiritualism আর Religion এক নয়। আজ কালকার যুগে Politics আর Religion অচল হয়ে যাবে। এটা Spiritualism.

শুক্রবার সন্ধ্যা

এখানে আমি প্রায় ১ বছর এসেছি। একটি মূর্তি প্রায়ই চোখে পড়তো বিরাট বিশাল বপু, উদরের পরিধিও খুব কম নয়। সবাই বলে বুড়োমা। কৌতূহল জড়ান চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতাম রঙ্গীন অথবা ডুরে সাড়ী পড়ে থপ থপ কোরে হাঁটার ভঙ্গী, মনে মনে ইচ্ছা হোত ওর পরিচয় জানিবার। দু'তিন

মাস হোল ওঁর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে। শুনিলাম উনি এক লেখকের স্ত্রী, ওঁর নাম বীণাপানি বন্দ্যোপাধ্যায় উনি তিন বছর এই হাঁসপাতালে রয়েছেন। রমনীবাবু (স্বামীর বন্ধু) দেখাশুনা করেন। সমস্ত গয়না রমনীবাবুর কাছে জমা আছে। বুড়োমা বলেন "রাশি (ছোট বোনের মেয়ে) সমস্ত চুরি করছিল আলমারী খুলে তাই শনিবারের চিঠিকে বললুম বাবু তোমার কাছে সব জমা রাখ"। বেলগাছিয়ায় বুড়োমার নিজের নামে বাড়ী আছে। ছোট ভাই বাড়ীতে থাকে। বুড়োমা বলেন "ছোট ভাইকেই বাড়ী দিয়ে যাব কারণ সে কষ্ট করে বাড়ীর ট্যাক্স দিচ্ছে।" বুড়োমার ছেলেপিলে কেউ নেই। বুড়োমার তিন ভাই তিন বোন ছিলেন। বড় ভাই ও ছোট বোন মারা গিয়েছেন। এখন দুই ভাই দুই বোন আছেন। মেজ ভাই পোস্টমাস্টার। বুড়োমা বলেন অনেক টাকা করেছেন। ৪০০০০ হাজার টাকা জমা করেছেন। বুড়োমার বাবার কয়লার ব্যবসা ছিল। বাবার কাছ হইতেও মেজ ভাই অনেক টাকা পেয়েছেন। স্বল্প অল্প মাইনে চাকুরী করে। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মাথায় ছিট আছে। বাপের বাড়ীতেই থাকে। তার চার মেয়ে। দুইটির বিয়ে হয়ে গেছে। দুইটি কুমারী। বুড়োমার বাপের বাড়ী চুচুঁড়া। বুড়োমা বলেন ছোটবেলায় বুড়োমার মা খুব মারতেন। বুড়োমা সজনে ফুল কুড়িয়ে আনতেন। তেল খরচ হবে বলে বুড়োমার মা সব ফেলে দিতেন। বুড়োমা বলেন, মা ল্যাংটো করে ইস্কুলে পাঠাতো। সেখানে গান করতে হোত পুতুল কোলে কোরে।......

"Lulleby Lulleby
dearest baby do not cry"

দুলে দুলে নেচে গান গেয়ে সকলকে শোনান। বুড়োমা বলেন চুচুঁড়ায় শক্তিশরের পুজায় খুব ধুম হয় বৈশাখ। বুড়োমা ছোটবেলায় একবার শক্তিশরতলা থেকে ঘটি চুরি করেছিলেন। পরে বড় হয়ে ননদের কাছ থেকে, পিতলের থালা ঘটি নিয়ে শক্তিশরকে দেন। চৈত্রমাস শক্তিশরতলায় মাল্‌পো হয় বুড়োমা সেইকথা বলেন তেলেভাজা ও মাল্‌পোর প্রতি বিশেষ আকর্ষন। একবার বুড়োমা ৩২৲ ভিজিট বুকের ডাক্তারকে দেখিয়ে দিলেন। প্রায়ই বুড়োমার কণ্ঠে ক্ষেদোক্তি শোনা যায় "আঁট কুড়ির ব্যাটাদের ৩২৲ টাকা না দিলে এ—ত তেলেভাজা হত।" বুড়োমা সিঙ্গাড়া ভালবাসেন বলে কনকদি (লুম্বিনী পার্কের psychologist) প্রায়ই সিঙ্গাড়া এনে খাওয়ান। কনকদিকে বুড়োমা ভীষণ ভালবাসেন। কনকদি আসবেন বলে শনি ও মঙ্গলবার পথ চেয়ে থাকেন। নিজের টিফিনের সিঙ্গাড়া মিষ্টি তুলে রাখেন কনকদির জন্য। ডাঃ চাটার্জ্জী এলেই বলেন "বাবুকে একগ্লাস সরবৎ এনে দে।" এখানকার আয়া ও আভাকে বুড়োমা বলেন "ভালবাসা"। বলেন আভার আমি বিয়ে দিয়ে দেব। বুড়োমার স্বামী বেঁচে থাকতেই বুড়োমা এই হাসপাতালে ভর্তি হন। তখন দু মাস তিন মাস ছাড়া বাড়ী যেতেন। বুড়োমা বলেন "কর্তা আমায় দেখতে আসতো রাবড়ি ও কালোজাম নিয়ে।" স্বামী মারা যাবার পর বুড়োমা এই হাসপাতালে তিন বছর আছেন। কনকদি খবর দিলেন ভাইকে বুড়োমাকে নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু ভাই নিয়ে যাচ্ছে না। বুড়োমার পরনের সাড়ী ছিঁড়ে গেছে। হাসপাতালের দেওয়া রঙ্গীন সাড়ী পরে ঘুরে বেড়ান। বুড়োমা খুব রসিক। আমায় হাসপাতাল হতে ছেড়ে দাও না হলে আমার অত গয়না বাড়ী কে ভোগ কোরবে? বুড়োমার মনটি শিশুর মত সরল। আমরা গান কোরতে বল্লেই বুড়োমা গান করে শোনান—"বধুঁ হে পুজিব চরণ দুখানি।" তার সঙ্গে কোমর দুলিয়ে অভুতপূর্ব নৃত্য। বুড়োমার স্টকে অনেক গান আছে "কোন গরীবের ধন তুমি, I shall come to me"

"যখন তোমার কেউ ছিল না, তখন ছিলাম আমি,
এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি।"

"ভাবনা কিরে কুটে
তোর মাথায় ভরা ঘুঁটে"

"গয়লা দিদিগো তোর ময়লা বড় প্রান
কেঁড়ে থৈ থৈ অথৈ জলে ভর্তি কানায় কান।"

"ভালবেসে কেঁদে মরি বাঁচা হ'ল দায়
কাল হ'ল কত খেলা আজ হেলা ফেলা
রবি ডুবে যায়।"

"কেন বিদেশে গেছ আমার প্রাণপতি
আমি যৌবনজ্বালায় জলে মহু দিবা রাতি
অফিসেতে পড়ুক বাজ বৃথা কেন লোকলাজ
তারি তরে ভেবে ভেবে পোহালো রাতি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রোগিনীর লেখা ডায়েরীর মধ্যে লোকের নাম অনেক ক্ষেত্রে বদলে দেওয়া আছে।

সার-সংকলন

THE ROLE OF HYPNOSIS IN THE TREATMENT OF INFERTILITY :—

সংবেশন (Hypnosis) একটী অবস্থা যেখানে দৈহিক শৈথিল্যের সঙ্গে মনের চরম অভিভাব্যতা (suggestibility) উপস্থিত থাকে। গ্রীক শব্দ 'Hypnos' (গভীর নিদ্রা) থেকে এর উৎপত্তি।

আফ্রিকার ডাক্তাররা, আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ডাক্তাররা প্রভৃতি অনেকে এবং হিন্দু ধর্মযাজকগণ যোগাভ্যাসের সাহায্যে সংবেশনের ব্যবহার করতেন।

ক্যাথলিক ধর্মযাজক যাঁরা সংবেশন ব্যবহার করতেন, তাঁদের "বিশ্বাস সুস্থ করে" এই চিন্তায় মেসমার অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি নিজের হাতকে রোগীর দেহের ওপর বা নিকটে নিয়ে গিয়ে সংবেশন করতেন। যে কারণে প্যারিসে রয়্যাল কমিশন্ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রণালীকে নাটকীয় আখ্যা দেয়। John Elliotson ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মেসমারের প্রণালীকে ব্যবহার করে অবশ্য সাফল্যলাভ করেছিলেন।

বর্তমানে সংবেশনের সময় রোগীকে কোথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলা হয়। এর ফলে চোখের পাতায় ক্লান্তি আসে এবং তখন শৈথিল্য আনার জন্যে ঠিকমত অভিবাবন (suggestion) প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এরিকসনের "হাত লঘুকরণ" প্রণালীও বর্তমানে ব্যবহার করা হয়। রোগী বিশ্বাস করে যে হাতের ওজন যত কমে যাবে দেহে তত শৈথিল্য আসবে। স্পর্শের সাহায্যেও শৈথিল্য আসে যদি তার সঙ্গে মৌখিক অভিভাবনের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি থাকে।

উনবিংশ শতাব্দিতে সংবেশন অবেদন (Anaesthesia) হিসাবে প্রচলন লাভ করতে পারেনি, কারণ সেই সময় ক্লোরোফর্ম, ইথার আবিষ্কৃত হয়। তা সত্ত্বেও ঐ সময় অবেদন হিসাবে সংবেশনের সফল ব্যবহার দেখা যায়।

ইদানীংকালে চিকিৎসাবিদ্যায় সংবেশনের ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৫৫ সালে British Medical Association এবং ১৯৫৮ সালে American Medical Association সংবেশনের প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

লেখকের মতে সংবেশন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কতগুলো ভুল ধারণা আছে। সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে সংবেশিত ব্যক্তি নির্জ্জীব। কিন্তু একথা ঠিক নয়। কেবল দুর্বলচিত্ত লোকেরাই সহজে সংবেশিত হয় একথাও সত্য নয়। আর এইটাই ঠিক যে সংবেশিত অবস্থায় কোন লোককে দিয়ে কোন বে-আইনী বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করান যায় না। কোন লোকের ব্যক্তিত্ব যে-ধরণের তার বিপরীত কোন কাজ তাকে দিয়ে করান সম্ভব নয়।

সংবেশনের জন্যে আদর্শ রোগী যে বুদ্ধিমান ও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারে। যা বলা হচ্ছে তাতে মনোনিবেশ করতে পারা এবং বিশ্বাস করা সংবেশক যা বলছে তা সম্ভব এবং তা ঘটতে পারে। সংবেশক এবং সংবেশিতের সম্পর্কই হচ্ছে সংবেশনের মূল কথা।

লেখক মনে করেন কোন চিকিৎসার পরিবর্তে সংবেশনকেই চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। অন্য চিকিৎসার সহায়করূপেই এর ব্যবহার।

Benedek এবং Rubenstein দেখিয়াছেন আমাদের দেহে যে সকল যন্ত্র মনের সঙ্গে সংযুক্ত, সেগুলোর পরিবর্তনের সঙ্গে হরমোনের উৎপত্তি বেড়ে গিয়ে সংবেদনের সৃষ্টি হয়। মনঃসমীক্ষণের সময় নির্জ্ঞান মনের কোন বিশেষ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হ'তে গিয়ে একটী অবিবাহিতা মহিলার শুক্রাক্ষরণ লক্ষ্য করেছিলেন Brichl এবং Rafke. লেখকের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। এক্স-রে ও হরমোন চিকিৎসাতেও শুক্রাক্ষরণ ভাল হয়নি এমন একটী এই বছরের অবিবাহিতা মহিলা সংবেশন চিকিৎসায় ভাল হয়েছিলেন।

লেখক বলতে চান মনের পরিবর্তনের সঙ্গে দেহের পরিবর্তন সম্ভব হয়। এই কারণেই বন্ধ্যাত্বের কারণ বেশীরভাগ সময়েই দেখা যায় মানসিক। অনেক গর্ভস্রাব রোগের কারণ দেখা যায় রোগিনীর নির্জ্ঞান মনের ছেলে হওয়ার অনিচ্ছা। যদিও এরা গর্ভস্রাব বন্ধ করার জন্যে ডাক্তারের কাছে আসে। এই ধরণেরই মনের ইচ্ছে অনেক সময়েই মেয়েদের বন্ধ্যা হওয়ার কারণ। বিজ্ঞান মনের মা হওয়ার অনিচ্ছার প্রতিরক্ষা হিসাবেই এই ধরণের বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হয়। সংবেশনের সাহায্যে নির্জ্ঞান মনের মানসিক এই বাধাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া যায়।

লেখক মনে করেন চিকিৎসার সহায়ক হিসাবে সংবেশনকে পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি ঠিক রোগীকে বেছে নেওয়া যায় এবং উপযুক্ত সংবেশক থাকে তাহলে সংবেশনে কোন ভয়ের কারণ থাকবে না এবং ভাল ফল পাওয়া যাবে।

[The Role of Hypnosis in the Treatment of Infertility—by Dr Leo Wollman, B. Sc., M. Sc., L. R. C. P. Ed., L. R. E. P. and S. Glas. The British Journal of Medical Hypnotism. VOL. 11, No. 3]

—তড়িৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়

CURRENT TECHNIQUES IN THE MANAGEMENT OF THE ANXIOUS CHILD :—

সাধারণ ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্নতিতে এবং শৈশবাবস্থার মানসিক গোলযোগ, ব্যক্তিত্ব ও প্রক্ষোভোজ জীবনে উৎকণ্ঠার (Anxiety) একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ফ্রয়েড, র‍্যাঙ্ক এবং অন্যান্য অনেকে বলেছেন, যে কোনো বিপদের জন্যে যে উৎকণ্ঠার প্রতিক্রিয়া হয় তার মূল হচ্ছে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর মনের ঘাত (trauma), মায়ের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা। এঁরা আরও বলেছেন শিশু জন্মের প্রথম মাসে এমন কিছু পরিপক্কতা লাভ করে না যার ফলে ঠিক উৎকণ্ঠা কি তা অনুভব করতে পারে। এই সময় কেবল স্বাতন্ত্রবিহীন শারিরীক পীড়ন অনুভব করে।

Greenacre দেখিয়েছেন প্রাপ্ত বয়সের সব মূল সমস্যার উৎপত্তি জন্মমুহূর্তে অথবা সেই সময় শিশুর জীবনহানির বা জীবনে ক্ষতির ভয় থেকে। তাঁর মতে জন্মের পূর্বে ও পরে, বিশেষ ক'রে কথা বলতে শেখার আগে শিশুর জীবনে যে সব ব্যর্থতা আসে সেগুলো তার মনে বিশেষ ছাপ রেখে যায়। তিনি দেখিয়াছেন শৈশবাবস্থার মানসিক পীড়ন শিশুকে অধিকতর অন্তর্মুখী এবং স্বকামজ (narcissistic) ক'রে তোলে এবং পরবর্তী জীবনে সঠিক জ্ঞানলাভে বাধা দেয়। ভবিষ্যতে জীবনে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে পারে এমন অবস্থার সম্মুখীন হলে শিশুকালের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা সহজেই প্রকাশ লাভ করে। শৈশবাবস্থার পীড়ন ও উৎকণ্ঠার ফলে ব্যক্তিত্বে প্রচয় (development) অস্বাভাবিক এবং ভ্রান্ত হয়ে পড়ে, আর অহমের নোদনা (drive) ঠিক পথে চালিত হয় না। রোগীর নিজস্ব সত্তা গড়ে ওঠে না এবং একসঙ্গে

অনেকরকম কাজ করবার ইচ্ছে প্রকাশ ক'রে সেগুলোর সঙ্গে সহজেই নিজেকে জড়িয়ে ফেলে আবার সহজেই সেগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে।

লেখকের নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে উৎকণ্ঠাজড়িত শিশুদের সম্বন্ধে Greenacre যে কথা বলেছেন মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত শিশুদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলতা, প্রত্যক্ষজ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভের অভাব এবং অতিরিক্ত বিশৃঙ্খল আবেগের ফলে অপরিপক্কতা, সঠিক বাস্তব জ্ঞান লাভের অভাব এবং একাত্মীকরণের অভাব প্রভৃতি মানসিক বৈকল্য দেখা দেয় যেগুলো শিশুর উৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে দেয়।

লেখকের মতে উৎকণ্ঠাজড়িত শিশুদের ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমে আমাদের সমস্যাকে ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে তাদের শারিরীক অক্ষমতা ছাড়াও উৎকণ্ঠাজড়িত সমস্যাগুলো থাকবে। এই ধরণের অতিরিক্ত উৎঠাজড়িত শিশুদের কোন কারণেই আত্মীয়পরিজন ও স্বাভাবিক সমাজজীবন থেকে সরিয়ে এনে বা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ক'রে হাসপাতালে বা পৃথক ক'রে রাখা উচিত নয়। এই ধরণের সমস্যাযুক্ত ছেলেরা এবং তাদের মায়েদের মধ্যে যে সম্পর্ক তার বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় একদিকে অতিরিক্ত স্নেহশীল এবং অপরাধবোধ-জড়িত মা এবং অন্যদিকে অতৃপ্ত, উৎকণ্ঠাজড়িত ও অনিশ্চিত ভাবাপন্ন শিশু। এক্ষেত্রে প্রয়োজন উৎসাহ এবং উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ। মায়েরও ঠিকমত বিশ্রাম নেওয়া দরকার এবং সেই সময় মায়ের কাজ করবার জন্যে অন্যকোন উপযুক্ত মহিলার সাহায্য নেওয়া দরকার। এ ছাড়া ঘুমের জন্যে এবং শান্ত করবার জন্যে রোগীকে কিছু কিছু ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এবং প্রত্যক্ষের গোলযোগ থাকার জন্যে এধরণের শিশুকে সংবেদনকে অতিরিক্ত উদ্দীপন করে এমন কিছু অবস্থার মধ্যে নিয়ে না যাওয়া উচিত। কিন্তু এ ব্যবস্থা সাময়িক হওয়া দরকার, অপ্রয়োজনে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ক'রে পৃথক ক'রে বেশীদিন রাখা উচিত নয়।

নিজের পরিবারের প্রতি রাগ বা বিদ্বেষ রয়েছে এমন ছেলেদের উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া এবং মনের জোর ফিরিয়ে আনতে পারে এমন ধরণের উৎসাহব্যঞ্জক চিকিৎসা করা প্রয়োজন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কেউ এ কাজ করবে। এই ধরণের ব্যবস্থার পর পুরোপুরি মানসিক চিকিৎসা চালু করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বের নানা উপকরণগুলোর মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনার জন্যে নিজের সত্তাকে জাগরিত করার মত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে তার উদ্ধারের কারণ তাকে দেখিয়ে দেওয়া এবং যে উৎকণ্ঠার পুরোপুরি সমীক্ষন সম্ভব হল না তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চিত্তভ্রংশীবাতুলতা (Schizophrenia) নামক মানসিক রোগের মধ্যেও উৎকণ্ঠাই আসল সমস্যা। এই রোগগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে যে সব লক্ষণ দেখা যায় মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত শিশুদের মধ্যে সেগুলো দেখা যায়। উৎকণ্ঠা থাকার জন্যে এদের কাছ থেকে মাতৃস্নেহের যথাযথ প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না এবং মানসিক পরিপক্কতাও স্বাভাবিক হয় না। এছাড়াও এদের মধ্যে ঘুমের, নিশ্বাস প্রশ্বাসের এবং অন্যান্য কয়েকটী শারীরবৃত্তিয় গোলযোগ দেখা যায়। এর পরিণতি বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনা বা আত্মসম্বদ্ধিতা (autism)। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা থাকার ফলেই শিশু বাইরের জগৎ থেকে সরে আসে। অন্যান্য উৎকণ্ঠাগ্রস্ত শিশুদের মতই এদের চিকিৎসা হওয়া দরকার। উৎকণ্ঠাগ্রস্ত মায়ের সন্ধান পাওয়া

গেলে একই সঙ্গে তারও চিকিৎসা করা দরকার। কারণ তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহার শিশুর উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দেয়। অবশ্য চিত্তভ্রংশীবাতুল শিশুর চিকিৎসার কথাও মনে রাখতে হবে।

আত্মসম্বন্ধিতার চিকিৎসার জন্যে শিশুর অবদমিত উৎকণ্ঠাকে জাগরিত ক'রে বাস্তবের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণতঃ বয়ঃসন্ধির সময় এই সমতা আপনিই ফিরে আসে। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে দেরী হয়ে যেতে পারে বলে তিন, চার বা পাঁচ বছর বয়সেই শিশুর ভালোমত চিকিৎসা করা প্রয়োজন। এই সময় সাময়িকভাবে বাড়ীর উৎকণ্ঠাজড়িত পরিবারের কাছ থেকে সরিয়ে রাখলে শিশুর পক্ষে উপকারী হবে। প্রয়োজন হলে ওষুধও ব্যবহার করা যেতে পারে।

যে সব শিশুদের জন্মের প্রথম মাস থেকেই পৃথকভাবে থাকতে হয়েছে তাদের মধ্যে যে লক্ষণ দেখা যায় আত্মসম্বন্ধিতা বা যারা নিজেকে জগৎ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছে তাদের মধ্যেও সে সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় প্রথম ধরণের শিশুদের মধ্যে উৎকণ্ঠা থাকে না। লেখক বলেছেন এসব ছেলেদের লক্ষ্য করলে উৎকণ্ঠার স্বাভাবিক প্রচয়কে বুঝতে পারা যায়। অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা ক্ষতিকারক হলেও স্বাভাবিক উৎকণ্ঠার প্রয়োজন আছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে, মা বা মাতৃস্থানীয়া ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মীকরণের জন্যে এবং স্থান ও কাল সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার জন্যে উৎকণ্ঠার প্রয়োজন। কিন্তু এগুলোর সবকিছুর অভাব দেখা যায় যে সব শিশুদের প্রথমেই পৃথক করে দেওয়া হয়েছে এবং যাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা নেই।

লেখক বলছেন মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত ও চিত্তভ্রংশীবাতুল শিশুদের সামান্য বিচ্ছেদ-উৎকণ্ঠার অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু যে সব ছেলেদের অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে তাদের পরে পৃথক ক'রে নিলেও বিচ্ছেদ-উৎকণ্ঠার বেশী প্রতিক্রিয়া হবে না। তাদের ক্ষেত্রে উৎকণ্ঠা কম ক্ষতিকারক। অবশ্য যদি খুব কম বয়সে পৃথক হয় এবং বহুদিন পৃথক থাকতে হয় তাহলে ক্ষতিকারক হতে পারে।

উৎকণ্ঠাজড়িত শিশুদের চিকিৎসার জন্যে দেখতে হবে তাদের উৎকণ্ঠার প্রবণতা চিত্তভ্রংশীবাতুলতা অথবা মস্তিষ্কে আঘাত অথবা শিশুকালে পৃথক হওয়ার জন্যে। এছাড়া সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে প্রথমে ঠিক আগের যে ঘটনার জন্যে উৎকণ্ঠা আরম্ভ হয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য রেখে উৎকণ্ঠা কমাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

[Current Techniques in the Management of the Anxious child :—by Lauretta Bender. M. D. ; New York. —American Journal of Psychotherapy ; Vol. xv, No. 3.]

—তড়িৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়

লুম্বিনি সম্বন্ধে

গত সংখ্যা চিত্ত প্রকাশিত হইবার পরে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ণসচিব মহাশয় এই হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। আমাদের নানা সমস্যা ও অসুবিধার কথা আমরা তাঁহাকে বলিয়াছি। তিনি ধীর ভাবে অত্যন্ত সহানুভূতি সহকারে আমাদের কথা শুনিয়া কি ভাবে লুম্বিনির কল্যাণ সাধন করা সম্ভব তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, ভারতীয় উন্মাদ আইন অনুসারে যে লাইসেন্স নেওয়া প্রয়োজন সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি সহানুভূতি সহকারে লুম্বিনির কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ বিষয় আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন এরূপ আশা তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। লুম্বিনির প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সাধুবাদ জানাইতেছি। রাজ্য সরকার এ বিষয় ক্রমে আরও অধিক নজর দিবেন আমরা এ আশা করি। মানসিক রোগ চিকিৎসার নানা সমস্যা সম্বন্ধে আমরা চিত্ত পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিয়াছি। এখানে আর পুনরুল্লেখ করিব না। রাজ্য সরকার ও জন সাধারণ একযোগে কোনো সমস্যার সমাধান করিতে মনযোগী হইলে তাহা সহজেই হইতে পারে। পূর্ব সংখ্যায় আমাদের মানসিক জড়তা উল্লেখ করিয়াছি। সে জড়তা যে আমাদের মনকে অজগরের মত জড়াইয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান সমাজ জীবনের যে কোনো দিকে তাকাইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পারা যায়। আমরা অতি মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হইয়া সহযোগ নীতি প্রায় বর্জন করিয়া বসিয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে নানা দিক হইতে উন্নতির বাণী ও আয়োজন কিছু কিছু করা হইয়াছে সত্য কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে চেতনা বা প্রেরণা কতটুকু জাগিয়াছে তাহা দেখিবার প্রয়োজন আছে। আমাদের মানসিক জড়তার কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। ভবিষ্যতে এই পত্রিকার পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কলিকাতার পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যেই নানা শ্রেণীর উন্মাদ রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের নাম ঠিকানাও হয়ত কেহ জানে না জানিতে কেউ চেষ্টাও করে না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাহারা পাগল আখ্যা পাইয়াই আমাদের সকল বিচার বিবেচনার বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। মানুষ বলিয়া কোন ঠাঁই তাহাদের নাই। আমরা এমন সহজ ভাবে তাহাদের উপেক্ষা করিয়া চলি যেন তাহারা সমাজের কেহ নহে, যেন তাহারা মানুষ বলিয়া গৃহীত হইবার দাবী করিতে পারে না। এই দুঃখ দুর্দশা ও রোগ সন্তপ্ত পঙ্গু বা অর্দ্ধপঙ্গুদের জন্য সামাজিক তথাকথিত সুস্থ সবল মানুষের কি কোনো দায়িত্বই নাই? যদি তা না-ই থাকে তবে আমরা যাহারা নিজেদের সুস্থ ও গর্বিত মানব জীবনের যোগ্য বলিয়া মনে করি তাহাদের মানসিকতাকে সুস্থ বলা যায় কি? এ প্রশ্নের সর্বাঙ্গ উত্তর শুনিয়াছি। যাহাদের মনে আজও প্রাণের সরসতা কিছু বাঁচিয়া আছে আমরা সমাজ জীবনের এই দুঃখ কাতর দিক তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম।

রোগাক্রান্ত হইয়া পরে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য লাভ করার চেয়ে রোগ নিবারণের চেষ্টা অর্থাৎ যাহাতে রোগ না হইতে পারে সেই চেষ্টা করা অধিকতর প্রয়োজন। সুতরাং রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন থাকা দরকার তেমনই সুস্থতা রক্ষা করিয়া চলিবার উপদেশনের ব্যবস্থাও থাকা দরকার।

মানসিক রোগ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। রোগ প্রতিকারের চেষ্টায় লুম্বিনি গত ২২ বৎসর হইল যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। গত দুই বৎসর হইল ১৪নং পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা ৯, ঠিকানায় শিশু উপদেশন কেন্দ্র (Child Guidance Centre) পরিচালিত হইতেছে। এই কেন্দ্রে উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক বিশেষজ্ঞগণ শিশুর প্রধাণনত মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া আবশ্যক উপদেশ দিয়া থাকেন। অস্বভাবি শিশুর (Problem Child) মানসিক চিকিৎসা ও অভিভাবকদিগকে শিশুর পালন সম্বন্ধে প্রয়োজন মত উপদেশ দেওয়া হয়। প্রতি বুধবার ও শনিবার বিকাল ৩-৫০ হইতে ৫টা পর্যন্ত এই কেন্দ্র খোলা থাকে। কোন শিশুকে কি ভাবে বিদ্যাশিক্ষা দিলে তাহার বেশী উন্নতি হইবে এ সম্বন্ধেও শিশুর মানসিক প্রকৃতি আধুনিক সম্মত উপায়ে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া দেওয়া যায়। শিশু উপদেশন কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে এই কাজ করা হইতেছে। মানসিক রোগ শৈশব কাল হইতেই সূচিত হয়। রোগের মূল কঠিন ভাবে চারিদিক বিস্তৃত হইয়া পড়িবার আগে প্রাথমিক অবস্থায় যদি সুচিকিৎসা করা হয় তবে ভবিষ্যতের অনেক কঠিন মানসিক রোগ হইতে শিশু মুক্ত হইতে পারে। এই দিকে আমাদের সমাজ সেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বহু জনসাধারণ শিশুর যে সকল লক্ষণ ছেলে মানুষী বলিয়া উপেক্ষা করেন পরে দেখা যায় সেগুলি উপেক্ষনীয় লক্ষণ আদৌ ছিল না। পিতামাতাদের দৃষ্টিও শিশুর এইসব সামান্য মানসিক প্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা যদি সময় মত বিশেষজ্ঞের উপদেশ নিয়া চলেন তবে ভবিষ্যতের অনেক অবাঞ্ছিত জটিল পরিবেশ হইতে রেহাই পাইতে পারেন। অতি সামান্য ব্যয়ে তাঁহারা শিশু উপদেশন কেন্দ্র হইতে এই সাহায্য পাইতে পারেন। সামান্য ভাবে মানসিক রোগ প্রতিরোধের এই দিকটাও আমাদের পাঠক পাঠিকা এবং জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত লুম্বিনির আয় ব্যয় ইত্যাদির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৬১ ইং সন

চিকিৎসার ফলাফল

মাস	আরোগ্য	উন্নতি	অপরিবর্তিত	মোট
জুলাই	২৭	১২	২	৪১
আগষ্ট	২৩	১৯	৯	৫১
সেপ্টেম্বর	১৪	১৬	২	৩২

ভর্তি ও নির্গম

মাস	ভর্তি	নির্গম
জুলাই	৩৫	৪১
আগষ্ট	৩৮	৫১
সেপ্টেম্বর	৪৩	৩২

বহির্বিভাগের মানসিক রোগী

মাস	নূতন	পুরাতন	মোট
জুলাই	৬৩	৩৫৫	৪১৮
আগষ্ট	৫৪	৩০৭	৩৬১
সেপ্টেম্বর	৫৩	২৯৯	৩৫২

আয় ও ব্যয়

মাস	আয়	ব্যয়
জুলাই	৭২,৯৫৬.৯২	২৭,৮৬১.৭৩
আগষ্ট	২২,৭১৬.২৫	৩৩,১১৫.৭৯
সেপ্টেম্বর	২৪,০১৭.৯১	৩৩,৬৯০.৫৮

Published by Dr. Tarun Chandra Sinha. D.Sc., for and on behalf of the Indian Psychoanalytical Society from Lumbini Park (Mental Hospital) 115, Dr. Girindra Sekhar Bose Road, Calcutta-39 and Printed by him from Indian Photo Engraving Co. Private Ltd., 28, Beniatola Lane, Cal-9. 29-1.

ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

: Indian Psycho-Analytical Society :

(Affiliated to the International Psycho-Analytical Association)

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন—

"লুম্বিনি পার্ক"

(মানসিক হাসপাতাল)

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩৯

মানসিক রোগের আবাসিক ও বহির্কেন্দ্রিক চিকিৎসা করা হয়।

লুম্বিনি ক্লিনিক

(মানসিক বিকলতার চিকিৎসা কেন্দ্র)

১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা-৯

প্রতি রবিবার, মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা হইতে ১০টা।

শিশু-উপদেশন্ কেন্দ্র

১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা-৯

অ-স্বভাবী শিশুদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করা হয় ও উপদেশ দেওয়া হয়।

প্রতি বুধবার ও শনিবার বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা।

— বোধয়ন —

(শিশু - বিদ্যালয়)

১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা - ৯

: সুকুমার-মতি শিশুদের বিদ্যালয় :

ও

: অ-স্বভাবী শিশুদের বিদ্যালয় :

— সমীক্ষা —

ইংরাজী ভাষায় মনঃসমীক্ষণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

কার্য্যালয় :— ভারতীয় মনঃসমীক্ষা সমিতি

১৪, পার্শি বাগান লেন, কলিকাতা-৯।

— চিত্ত —

বাংলা ভাষায় মনোবিদ্যা বিষয়ক সর্বসাধারণের উপযোগী বৈজ্ঞানিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

কার্য্যালয় :— "লুম্বিনি পার্ক"

ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বোস রোড, কলিকাতা-৩৯।

চিত্ত

নিয়মাবলী

১। "চিত্ত" ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বাংলা সনের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরবর্তী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে ডাকঘরে খবর লইয়া জবাব সহ জানাইতে হইবে।

২। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি মনোনয়নের ভার সম্পাদকের উপর থাকিবে।

৪। সম্পাদক প্রয়োজন বোধ করিলে প্রবন্ধাদির আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা বিশেষ অংশ বাদ দিতে পারিবেন।

৫। এই পত্রিকার প্রকাশিত লেখা অন্য পত্রিকায় বা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে হইলে "চিত্ত"র সম্পাদকের লিখিত সম্মতি প্রয়োজন হইবে।

৬। যে সংখ্যায় যাঁহার লেখা প্রকাশিত হইবে সেই সংখ্যার দুই কপি পত্রিকা লেখককে বিনা মূল্যে দেওয়া হইবে।

৭। "চিত্ত"র বাৎসরিক চাঁদা ৩৲ (তিন টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা মাত্র। পৃথক্ ডাকখরচ দিতে হয় না। বৎসরে যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।